শিক্ষ সত্র
(পুনর্মিলন স্মারক পত্রিকা)
প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ (১৯২৪ - ১৯৯৯)

জনগনের সার্বিকে উন্নয়নের নিরিখে শিক্ষা।
সার্বিক শিক্ষা প্রচারে সমস্ত স্তরের মানুষের
সহায়তা নিয়ে আমরা চলাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মনসা হাঁসদা
সভাপতি
বোলপুর - শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতি

শিক্ষ সত্র

(পুনর্মিলন স্মারক পত্রিক)

১৯২৪ - ১৯৯৯

প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ

শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

প্রাক্‌কথন

যে কোনো শিক্ষায়তনে পুনর্মিলন উৎসবটি একটি বিশেষ সংবাদ বহন করেই উপস্থিত হয়। সেই সংবাদটি হল কোনোও শিক্ষায়তনের বিশেষ ঐতিহ্যের একটি অন্তঃসলিলা পরম্পরা এবং তার দ্বারা বাহিত বা ভাবিত হয়েই প্রাচীন ও নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ একটি দিনে একত্র মিলিত হয়ে পুনর্মিলন উৎসবটি উদ্‌যাপন করে।

বিগতদিনের স্মৃতিচারণা, বর্তমানের প্রাণোচ্ছল প্রোজ্জ্বল দিনের উপস্থিতি এবং সংগতভাবেই আগামীদিনের প্রাচীন-নবীনের মতো সমীকরণের সমৃদ্ধ পদচারণার প্রতিশ্রুতিই পুনর্মিলন উৎসবের মুখ্য বিষয়।

বিশ্বভারতীর প্রাচীন গৌরব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরম্পরা বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়ার পশ্চাতে পুনর্মিলন উৎসবের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রাক্তন ও প্রাক্তনীরা স্বভাবতঃই এই মিলনে শিক্ষাসত্রের প্রাচীন গৌরবকে গুরুত্ব দেবেন এবং নব্য প্রজন্ম সেই প্রাচীন গৌরবকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে ও এই পরম্পরা বহনে এক অলিখিত মানসিক প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ হবেন - এই আশা নিয়ে উৎসবের সার্থকতা কামনা করি।

শিক্ষাসত্রের প্রাটিনাম-জয়ন্তী বৎসরে বর্তমান ও প্রাক্তনদের লেখা এই পুস্তকটির প্রকাশনার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে কোন শিক্ষায়তনে পুনর্মিলন উৎসবটিকে ধরে রাখতে হলে এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। স্মৃতিচারণা, বর্তমানের প্রাণোচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীর কিছু কথা এবং ভাবীদিনের প্রতিশ্রুতিই এর মুখ্য বিষয়। শিক্ষাসত্রের প্রাচীন গৌরবকে গুরুত্ব দেওয়া ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সেই গৌরবকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার বাসনাবিজড়িত এই পুস্তক টি'র সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

স্মরজিৎ রায়
অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

সম্পাদকীয়

— অতীত ও বর্তমানের এই মিলনোৎসবটি যেমন অনাবিল আনন্দের তেমনি গভীর তাৎপর্যবহ। পুনর্মিলন কথাটির অর্থ পুনরায় মিলিত হওয়া। যে - কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুগভীর। কেবলমাত্র বর্তমানের ভিতরেই কোনো প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ অতীতের প্রেক্ষাপটেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। তাই পুনর্মিলনের দিনটিতে আমরা, অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান একযোগে মিলিত হয়ে রচনা করি ভবিষ্যতের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কেবল তত্ত্বগত দিক্ থেকেই নয়, এর বাইরেও পুনর্মিলনের একটি বিশেষ আবেদন আছে। তা হ'ল ফেলে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ, হারিয়ে যাওয়া মুখগুলির সঙ্গে পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার আনন্দ। কিছুক্ষণের জন্য অতীতচারিতায় হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আজ সেই আনন্দেরই স্মারক হিসাবে শিক্ষাসত্রের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হ'ল বিচিত্র স্বাদের, বিচিত্র রসের নানা রচনা নিবন্ধ ও কবিতায় গাঁথা এই পত্রিকা। শিক্ষাসত্রে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা আছেন, যাঁরা থাকবেন সকলকে আজ পত্রিকা প্রকাশের আনন্দময় মুহূর্তে জানাই হার্দিক শুভেচ্ছা।

রোহন দাস
শাশ্বত মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম-সম্পাদক, পুনর্মিলন উৎসব সমিতি,
শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী, ১৯৯৮-৯৯

নিবেদন

'আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন — এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না — গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া ক'রে এইটে ঘোরানো চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অস্ত্র করতে হবে, তারপরে শরীরবিজ্ঞান।' — গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ আমরা অন্তরে ধারণ করেছি শিক্ষাসত্রের দীর্ঘ যাত্রাপথে। আজ পঁচাত্তর বছরের 'মাইলস্টোন'-এ এসে দাঁড়িয়ে সারা ভারতের মনোভূমিকে স্পর্শ করছি — এখানে, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে।

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই ক' খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাব মুক্ত করতে হবে — সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান বাজনা, কীর্তন পাঠ চ'লবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক' খানা গ্রামকে এইভাবে তৈরী করে দাও। আমি ব'লব এই ক' খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তাহলেই প্রকৃত ভারতকে পাওয়া হবে।' — এই প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব কেবল এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী - শিক্ষাকর্মীদের নয়। আমরা যারা শিক্ষাসত্রে শিক্ষালাভ করেছি - তারা সবাই মিলিত হয়ে গুরুদেবের 'ভারতবর্ষ' নির্মাণের স্বপ্ন সফল ক'রব — শিক্ষাসত্রের প্লাটিনাম জয়ন্তী বছরে পুনর্মিলন উৎসব প্রঙ্গণে ঘোষিত হয়েছে সমবেত প্রাণের শপথবাণী।

শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং মিলনানুষ্ঠানের আয়োজকরা স্থির করেছিলেন, তাঁদের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা আশা-আকাঙ্ক্ষার মিলনসূত্র হিসাবে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ ক'রবেন — যা হবে, এই শিক্ষায়তনটির স্রষ্টার প্রত্যাশাপূরণের ভিত্তি। পুনর্মিলন উৎসবের এই স্মারক-সংকলনে শুধু বিগতদিনের শিক্ষার্থীরা নন, বর্তমান পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরাও তাঁদের অন্তরের আশা-স্বপ্নের রত্নগুলি ধরে দিয়েছেন ছোটবড় রচনার পত্রপুটে।

প্রসঙ্গতঃ, পুনর্মিলন উৎসবের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিয়ে রাখি। ২৮ ফেব্রুয়ারী '৯৯ দিনটি সারাক্ষণই ছিল আনন্দমুখর, প্রতিমুহূর্ত ছিল সুরতরঙ্গিত কথা কল্লোলে প্লাবিত হয়েছে - হৃদয় উঠোন, অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। সকালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীদিলীপ সিংহ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের আলোকে উদ্ভাসিত হয় আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় শিক্ষাভূমি। যথারীতি অনুষ্ঠান শুরু হয় নবীন-প্রবীণ, প্রাক্তন-বর্তমান, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মী-আশ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে। আনন্দে স্পন্দিত এই সভাটি পরিচালনা করেন প্রাক্তন ছাত্র ডঃ প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষাসত্রের মাননীয় অধ্যক্ষ স্মরজিৎ রায় এবং শ্রদ্ধেয় উপাচার্যের মনোজ্ঞ ভাষণ সভাটিকে সমৃদ্ধ করে। সেই সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিচারণা ছিল এই সভার মণিভূষণের মতো। একটি অবিস্মরণীয় সুরছন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেন নৃত্য-সঙ্গীতের শিল্পীরা। তৎসহ পরিবেশিত হয় 'ডাকঘর'এর শ্রুতিনাট্যরূপ। উৎসবের অনাড়ম্বর আন্তরিকতা ছিল হৃদয়স্পর্শী।

পরিশেষে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাঁরা পুনর্মিলন উৎসব ও স্মারক পত্রিকা প্রকাশের নানান কর্মোদ্যোগে সাহায্য - সহযোগিতা ক'রেছেন অকৃপণভাবে।

জয়তী ঘোষ
আহ্বায়িকা
শিক্ষাসত্র, পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি স্মারক-গ্রন্থ উপসমিতি

সূচীপত্র

গল্প

প্রবন্ধ

কবিতা

প্রবন্ধ

গল্প

প্রবন্ধ

বিশ্বভারতী

...... সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফী প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্র. বৈশাখ ১৩২৬ — রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় উদ্যোগ

দিলীপকুমার সিংহ, উপাচার্য, বিশ্বভারতী

সমবায় কথাটা আজকের নয়। সমাজের সাবেকী সম্প্রদায়ে পোশাকীভাবে আলোচিত হয়েছে। আর যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয়ভাবে, তাঁদের ভাবনা-চিন্তা অন্যধরনের। রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের আঙ্গিকে 'সমবায়' এক রূপ নিয়েছিল, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় / তৃতীয় দশকে যা বহু লোককে অনুপ্রাণিত করেছিল। চীনদেশেও আরেকরূপ, হয়ত আপেক্ষিকভাবে রূঢ়, আপাতদৃষ্টিতে অমানবিক কিন্তু ফলপ্রসূ। যাঁরা পল্লী-সংস্কারে, পল্লী-উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে গান্ধীজীর সমবায় সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী একধরনের, অনেকে তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ ক'রে সফল হয়েছেন, অনেকে শিকারও হয়েছেন, সামাজিক রীতিনীতির ভ্রূক্ষেপ না করার জন্য। পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাজনীতির আবর্তে পল্লীসমাজ পড়েছে, এ রাজনীতি দলমত-নিরপেক্ষও নয়। হওয়া শক্ত, বিশেষ-বিশেষ স্থানে অবশ্য উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে মহিলা সদস্যদের জন্য, যাঁরা, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন দলমতনির্বিশেষে উন্নয়নের কাজ, রাজনীতি বা আমলাগিরি বা পক্ষপাতিত্ব-দ্বারা, বিঘ্নিত হতে সচরাচর দেন না। যা হোক, পঞ্চায়েতে সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, তা আলোচনা-সাপেক্ষ, প্রয়োগের আগে। অনেকেই এই পর্যায়ে এখনও বলে থাকেন, এই প্রায়োগিকতা সম্পর্কে, কিন্তু বাস্তবায়নে কোথায় যেন বাধা পেয়েও থাকেন। তার অনেক কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে, তবে যাই বলা যাক্ না কেন, মানবিকতা যে মূল কথা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, মূলতঃ অন্তর্দলীয় রাজনীতির চাপে বা একপেশে আক্রোশে, তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। অন্যদিকে গড়ে উঠছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারী সংগঠন যারা নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বা কালিমাপ্রচারের শিকার হলেও, যে কাজ করে যাচ্ছেন, তা সাধারণের কাছে ভাল বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। দৈন্য যে আছে তা শিক্ষাগত হোক, বুদ্ধিগত হোক, অপটুতাগত হোক, তা আজ স্বীকৃত হ'তে চলেছে পল্লী সমাজের নানাবিধ কর্মসূচীর মধ্যে। রাজনীতিমুক্ত না হ'লে বোধহয় আর প্রতিকার সম্ভব নয় — এরকম একটি ভাবনা বেশকিছু লোকের মনে শিকড় গড়তে চলেছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! কি ক'রে সুরাহা হবে তাও ভাবা হচ্ছে। জওহরলাল নেহরু নানা প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সমবায়' সম্পর্কে, রুশদেশের কর্মসূচী তাঁকে অনেক প্রভাবিত করেছিল একসময়ে — তিনি রাজনীতির লোক হ'লেও গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও কর্মসূচী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, অবশ্য ভারতবর্ষের পল্লীসমাজের কথা ভেবে।

বেসরকারী সংগঠন হিসাবে ভারতবর্ষব্যাপী পল্লীগ্রামে অনেকে কাজে নেমেছিলেন ও এখনও কাজ ক'রে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা থেকে যা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন সংগঠনের উন্নতিকার্যে তা মূলতঃ বেসরকারী। শ্রীনিকেতনের কথা কে না জানে ? তাঁর সময়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে, বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গ্রামেরই কর্মব্রতীরা কি না গ্রহণ ক'রেছিলেন ? তা ভাবলে আজ বিস্মিত হতে হয়; সরকারী অনুদান না পেয়েও। কাজে তাঁর সাথী হয়েছিলেন দিক্‌পালরা। নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ছাড়া ছিলেন জামাতা নগেন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার, ধীরানন্দ রায় ও লিওনার্ডএলম্‌হার্স্ট। কত লেখা, কত কাজ, কত মানুষকে নানা দিক থেকে যাঁরা অনুন্নত, তাঁদের সামিল করানো, মহিলাদেরও নানাধরণের কাজে, সংগঠনে অংশীদার করানো বিশেষ করে যেখানে নৈপুণ্য লাগে।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সক্রিয় ছিলেন, তার নজির অনেক; বিশেষ ক'রে, বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ দশকের শেষের দিকে। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিও তাঁর কাছে 'সমবায়' সম্পর্কে কথা শুনতে চেয়েছে। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে সমবায়ের কথা আছে, আবার নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'জাতীয় ভিত্তি' গ্রন্থে ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সমবায় সম্পর্কে। এই জামাতা নগেন্দ্রনাথ 'সমবায় তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন' ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকজন আত্মীয়ও এই কাজে

নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায় সম্পর্কে সভা-সমিতিতে আমন্ত্রিত হতেন বিশেষজ্ঞ হিসাবে এবং তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল প্রণিধানযোগ্য। যেমন ১৯২৭ সালের ২রা জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন-সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠানে উনি সভাপতি হয়েছিলেন। এই ভাষণই পরবর্তীকালে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে প্রবন্ধ হিসাবে ছাপা হয়েছিল। 'সমবায়' কাজে লাগাবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা হয়। জমিদারীতে প্রজাদের মধ্যে সমবায়ের নীতি প্রয়োগ করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতেও সমবায় সম্পর্কে তাঁর কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ নজির আছে। এমনকি হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যা মূলতঃ সমবায় সমিতি হিসাবেই ভাবা হয়েছিল তার সঙ্গেও উনি যুক্ত ছিলেন।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, লিখেছিলেন তা পরে 'সমবায়নীতি' পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের উদ্যোগে 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ'মালার একটি প্রকাশন হিসাবে। বলা বাহুল্য তা অনেকবারই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয় ১৯৬৩ সালে এর ইংরেজী তর্জমা 'The Co-operative Principle' নামে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশ করেছিলেন। এই বইদুটিতে যা আছে তা নিয়ে কিছু উল্লেখ করা যায়। 'সমবায়নীতি'র 'ভূমিকা' আজও প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সমবায়'এর মূলতত্ত্ব হ'ল : (ক) জনসাধারণের নিজের অর্জন শক্তিকে 'মেলাবার উদ্যোগ', (খ) 'অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার উপায়', (গ) 'যাহাতে মানুষ মিলিয়া বড় হইবে', (ঘ) শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় বড় হইবে। সমবায় ১, সমবায় ২ প্রবন্ধদ্বয় আজও প্রাসঙ্গিক। প্রথমটিতে মূল কথা হ'ল গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিদের শিক্ষা দিয়ে আত্মশক্তি জাগানো ও 'দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষা' দিয়ে 'পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে' তাদের 'মনের যোগ' ঘটিয়ে দেওয়া। গ্রামের মানুষ যখন থেকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তা দূর করা শিক্ষা দ্বারা। আবার কাজের ক্ষেত্রেও তাদের পরস্পর মিলিয়ে দিয়ে 'পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে' তাদের 'কাজের যোগ' ঘটিয়ে দেওয়া যা আজ 'বিশ্বায়ন' আখ্যা দিয়ে থাকি। WTO'র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের নানা পদ্ধতির কথা বলি, উৎপাদন কাজে যাঁরা রত আছেন, পল্লীঅঞ্চলে তাদের কাজ যে কী বিশ্বত্ব অর্জন করতে পারে ও পারা উচিত, তার কথা রবীন্দ্রনাথ কত আগে ভেবেছিলেন। গ্রামের মানুষকে তার সুযোগ করে দিতে হবে। 'সমবায় ২' প্রবন্ধে প্রজার মধ্যে 'আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি' আছে 'তারই সমবায়ের দ্বারা' রাষ্ট্রশাসনের শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলার কথা বলেছেন -- এই তো হ'ল গণতন্ত্রের মূলকথা। পঞ্চায়েত মাধ্যমে আমরা 'Capacity building' র কথা যা বলে থাকি, তার-ই মূল রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে অনুরণিত হয়েছিল। স্বায়ত্বশাসন-চর্চার সময় আমরা এইসব কথা বলে থাকি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব'।

'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' প্রবন্ধটি অসাধারণ, 'স্বদেশী সমাজ'-এ তার আংশিক উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন - 'সচেতন করার কাজে' নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অনবদ্য বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে - দেখা উচিত কতখানি আজ প্রযোজ্য। 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধটি সবারই পাঠ্য হওয়া উচিত - পরিপ্রেক্ষিত, বিশ্লেষণ ও উপসংহারে'র দিক থেকে এইটি হ'ল দীর্ঘ ও আসল প্রবন্ধ যেখানে বলা হয়েছে 'সমবায় নীতি' কী। তাঁর কথায় : "আমাদের চেষ্টা ক'রতে হবে, আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা।" একেই বলে সমবায়নীতি।

'সমবায়' নিয়ে বহুবার নানা জায়গায় বলেছেন, 'পল্লীপ্রকৃতি' সংকলনেও আছে। এমনকি 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স', যা হ'ল সে যুগের একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন, সেখানে সভাপতি হিসাবে ভাষণে উপরোক্ত অনেক কথার ইঙ্গিত আছে।

পুরোনো সে দিনের কথা

সুশীলকুমার মন্ডল, প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে শিক্ষাসত্রে। শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছে নানা ভাবনা-চিন্তা বিভিন্ন সময়ে। পারিপার্শ্বিক চাপ ও পরিবর্তিত পরিস্থিতেতে আবার ভাবনা-চিন্তা নানা সময়ে পরিবর্তন ক'রতেও হয়েছে। তবে ১৯৫২ - ৫৪ সালের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ এই সময়ে ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের প্রচেষ্টায় (তখন তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সচিব) পশ্চিম বঙ্গ সরকার এক লক্ষ তেরো হাজার একশ চার টাকার একটি অনুদান বিশ্বভারতীর মাধ্যমে শিক্ষাসত্রকে দেন। তখন এ অনুদান যথেষ্ট ছিল। তখন তো বিশ্বভারতীতে আজকের মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তখনই শিক্ষাসত্র কারিগরী শাখাসহ গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ ক'রল পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও বিশ্বভারতীর কাছে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিকেতনে অবস্থিত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত মেয়েদের M. E. School 'টিকে শিক্ষাসত্রের সঙ্গে যুক্ত করে এটিকে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হল। এর পূর্বপর্যন্ত এটিতে শুধু বালকেরাই শিক্ষার সুযোগ পেত।

১৯৫৪-৫৫ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক বিরণীতে দেখা যায় ' The Academic council as well as the Karma - Samiti has recognised the Satra as the regular school of the Visva-Bharati University with School Certificate and Senior School Certificate.' : এ সময়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য-পুস্তক ও সিলেবাস নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল শিক্ষাসত্রের কর্তৃপক্ষের উপর, কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠক্রম ছিল বিশ্বভারতীর শিক্ষাসমিতি দ্বারা অনুমোদিত ও যথানির্দিষ্ট। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত যে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিত সেই পরীক্ষাই শিক্ষাসত্রের ছেলেমেয়েদের দিতে হ'ত।

এরপর থেকে শিক্ষাসত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এইসময়, ১৯৫৫ সালে আমি শিক্ষাসত্রে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষকরূপে যোগদান ক'রলাম। তবে তখন অন্য বিষয়ও পড়াতে হ'ত, শুধু ভূগোল নয়। একটা সত্য তখন আবিষ্কার করলাম যে যে বিদ্যা অর্জন ক'রে শিক্ষক হয়েছি, তা শিক্ষকতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বিদ্যাদানের হদিসও আমার জানা নেই। বিষয়জ্ঞান কম, দানের পদ্ধতিও অজ্ঞাত। তাই আমি যেমন ছাত্রদের তৈরী ক'রতে লাগলাম, তেমনি ছাত্ররাও আমাকে তৈরী ক'রতে থাকল।

এই হ'ল কর্মজীবনের শুরু। সেইসময় শিক্ষাসত্রে স্থানীয় বালক ছিল খুবই কম। সে তুলনায় স্থানীয় বালিকার সংখ্যা ছিল বেশী। বালকদের অভিভাবকরা ভাবতেন শিক্ষাসত্রে কারিগরী কাজে বা হাতের কাজে জোর বেশী, লেখাপড়া তেমন হয় না। কী হবে কাঠে র‍্যাদা মেরে আর তাঁতে মাকু ঠেলে। ছেলেগুলোকে তো মানুষ হতে হবে, ক'রে খেতে হবে। তাই ছেলেরা প'ড়ত বোলপুরে। মেয়েদের 'যা-হয় হোক' তাই মেয়েরা আসত শিক্ষাসত্রে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল শ্রীনিকেতনের কাছের গ্রামগুলি যেখানে শিক্ষার আলো বেশি পৌঁছানোর কথা, সেখানে পল্লীসংগঠনের কাজ চলছে, কিন্তু খুব কম ছেলেমেয়েই বিদ্যালয়ে যায়। তখন আমাদের সকাল বিকাল দুবেলা স্কুল। বিকালে ছুটি হ'লে আমরা কয়েকজন শিক্ষক গ্রামে প্রতিনিয়ত যেতাম। মহিদাপুর গ্রামের জর্দিশ মোল্লার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাঁরই সহায়তায় বেশ কিছু ছাত্র আমরা শিক্ষাসত্রে আনতে পেরেছিলাম। তারা সকলেই জীবনে বেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুরুল থেকে আসা 'যা-হয় হোক' ক'রে ভর্তি-ক'রা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাবর প্রথম শ্রেণী পেয়ে এম. এস্‌সি পাশ ক'রে অধ্যাপিকা হ'ল। ক্রমে আমরা লোহাগড়, বিনুরিয়া, ডাঙ্গাপাড়া, ইসলামপুর, রূপপুর, বাহাদুরপুর, কেন্দ্রডাঙ্গাল, বল্লভপুর, মহুলা, যাদবপুর, সাত্তোর প্রভৃতি গ্রামে হেঁটে বা সাইকেলে ঘুরে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী আনতে পেরেছিলাম। তখন নিজেদের

উৎসাহে বা মনোরঞ্জন দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে বেশ কিছু ছেলে আমার কুটির থেকে আসত। তবে কাছাকাছি সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে আমরা অকৃতকার্য হয়েছিলাম। ক্রমে শিক্ষাসত্রের চারপাশের গ্রামগুলিতে শিক্ষাসত্র সম্পর্কে ভাল ধারণা হতে শুরু ক'রল। তখন শিক্ষাসত্রের একটি ছাত্রাবাসও ছিল। দূর-দূরান্তরের ৩৫-৪০টি ছেলে থাকত ছাত্রাবাসে। সকালের রুটিনে থাকত লেখাপড়ার কাজ, বিকালে হাতের কাজ। শিক্ষাসত্রে আমরা তখন মাত্র ৭ জন বিশ্বভারতীর শিক্ষক আর ৩/৪ জন পঃ বঙ্গ সরকারের 'স্পেশাল ক্যাডারে'র শিক্ষক। এই নিয়ে আমরা তখন পাঠভবনের মতো প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলাম। আমাদের ছেলে-মেয়েরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রেছে। লেখাপড়ায় যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কম নয় তা প্রমাণিত হয়েছিল। খেলাধূলায় আমাদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন ছিল। তখন স্কুলের 'স্পোর্টস্' শান্তিনিকেতন মাঠেই হ'ত। শান্তিনিকেতনের অনেকেই ব'লতেন, 'ওরা গাঁয়ের ছেলে, ওরা তো পারবেই।' এটা নিন্দা না প্রশংসা বুঝে উঠতে পারতাম না।

ছেলেদের দল নিয়ে বছরে দু-একবার গ্রামে গিয়ে ক্যাম্প করা হ'ত। দিন পাঁচ-সাত থাকতাম গ্রামের স্কুলে বা ক্যাম্প খাটিয়ে। এ এক নতুন আস্বাদ। নানা কার্যসূচী থাকত। গ্রাম-পর্যবেক্ষণ, নানা তথ্য সংগ্রহ, গ্রামীণ সংস্কৃতিকে জানা, জীবিকা আরও সহজ ও সচ্ছল কীভাবে করা যায় তা নিয়ে পর্যালোচনা করা, শিক্ষার হার কীভাবে বাড়ানো যায় সে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, আরও কত কী। একবার জয়দেব-কেন্দুলীর মেলার আগে কেন্দুলীতে আমাদের ক্যাম্প হ'ল। কদমখণ্ডীর ঘাটে যাত্রীরা পুণ্যস্নান করেন। এত ভীড় হয়ে যে স্নানান্তে ওঠার সময় বা স্নানার্থে নামার সময় ভাঙ্গাচোরা ঘাটে শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধরা প'ড়ে যান। অনেকে পদপিষ্টও হন। এই ঘাট আমরা মেরামত করার চেষ্টা ক'রতে লাগলাম। অনেকদিনের পুরানো কিছু খেজুর গাছ পাওয়া গেল। সেগুলি টুক্‌রো ক'রে, বাঁশের খুঁটি পুঁতে তা দিয়ে ধাপ তৈরী করা হ'ল। সেবার মেলায় ঐ ঘাটে কোনও অঘটন ঘটেনি।

একবার কোগ্রামে আমাদের ক্যাম্প হ'ল। কোগ্রামে পল্লীকবি কুমুদরঞ্জনের বাড়ী। আমরা যথারীতি আমাদের সমাজসেবামূলক কাজ শুরু ক'রেছি। এরই ফাঁকে একদিন গেলাম কবি-সন্দর্শনে। কবি আমাদের পেয়ে খুবই খুশি। তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক পুরানো দিনের কথাবার্তা ব'ললেন। তারপর আমাদের সকলকে বেশকিছু খাওয়ালেন। খাদ্য পরিবেশন ক'রলেন তাঁর ছেলে জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয়।

কবি বললেন : তোমাদের কথা ঘরে বসেই শুনতে পাচ্ছি গো। তোমরা গাঁয়ের পথঘাট মেরামত ক'রছ, আরও কত কী ক'রছ। গুরুদেবের আশ্রমের ছেলে তোমরা । তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা।

একটি ছেলে তার খাতাখানা কবির হাতে দিয়ে আবদারের সুরে বললে — আমাদের জন্য একটা কবিতা লিখে দিতে হবে। কবি সঙ্গে - সঙ্গে লিখে ফেললেন :

মোদের ঘাটে এলো
সোনার তরী তোমাদের
শীতেই এল শ্রীপঞ্চমী
খবর বসন্তের।
অলস বিকাল হ'ল আহা
কী রমণীয় !
পেলে আশিস ভালবাসা
জয়ধ্বনিও
আকাঙ্ক্ষা মোর লিখে দিলাম
ধূসর পত্রে
শিক্ষাসত্র মিলুক গিয়ে
অমৃত সত্রে।।

কবির হাতের লেখা এই কবিতাখানি কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে শিক্ষাসত্রে রেখেছিলাম।

ফেরার সময় প্রণাম সেরে উঠতেই কবি ছাত্র ও শিক্ষকদের অনেককেই বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন। সেই অকৃত্রিম স্নেহ আজীবন মনে থাকবে। আমাদের শিক্ষাসত্রের কিছু ধানজমি ছিল। সেখানে আমরা ছাত্র-শিক্ষক মিলে চাষ ক'রতাম। লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, বীজ টানা, চারা রোয়া সবই ক'রেছি। ছেলেমেয়েদের সে কী আনন্দ! কবির কবিতা যেন সার্থক রূপ পেয়েছে :

'মোদের যেমন খেলা
তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই —
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই। ....'

শ্রীনিকেতনের সব উৎসবই ছিল যেন শিক্ষাসত্রেরই উৎসব। ছাত্র-ছাত্রী , শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই আমরা এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। তখন শিক্ষাসত্র ছিল ছোট্ট প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই কম। তবে যেটা বেশি ছিল তা হ'ল মমত্ববোধ। অনেকটা একই পরিবারের মতো। আমরা ছেলেদের শাসন ক'রতাম, বকতাম কিন্তু অন্য কেউ আমাদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বিরূপ কিছু ব'ললে আমাদের খুব রাগ হত। শিক্ষকতা জীবিকায় এসে অর্থকষ্ট কিছু পেয়েছি, কিন্তু আনন্দ যা পেয়েছি তাতে ঐ কষ্ট তুচ্ছ হয়ে গেছে।

পরিশেষে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শিক্ষক ও ছাত্রের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠুক এবং ছাত্র-শিক্ষকের যাত্রা সফল হোক। এ প্রার্থনা জানিয়ে আমার স্মৃতির টুক্‌রো কথা শেষ ক'রছি।

কবির ইস্কুল

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

Siksha-Satra ... should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects.

কবি-শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিক নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু কাজ হয়েছে এবং সেই সমস্ত লেখালেখির মধ্যে মূল্যবান গ্রন্থও রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার নয়। সেইজাতীয় কাজের মধ্যে রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার তত্ত্বগত দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ ও সমাজজীবনে কবির সেই শিক্ষাচিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে তেমন কিছুই কাজ হয় নি। বাস্তবিকপক্ষে এই অনালোচিত বিষয়টির যথাযথ বিশ্লেষণের দ্বারা শুধু যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে, তা-ই নয়, সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মানব-দরদী কবি-শিক্ষাবিদের সদাজাগ্রত মানসিকতারও সত্যকার পরিচয়টি স্পষ্টতর হবে। আমরা আজ যে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (activity-centric education) কথা শুনি, রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তায় মানবীয় শক্তির যথাযথ বিকাশে তার সার্থকতা, তাকে শুধুই বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামান্তর মনে ক'রলে ভুল হবে। উৎপাদনমুখী বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা পরবর্তীকালে গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র অর্থকরী সেই বিদ্যাকে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের চিত্তের স্ফূর্তি ও বিকাশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন নি। কবি যে শিল্পগুরু নন্দলালকে ছবি-আঁকা মডেলিং ইত্যাদি শেখাবার জন্য শিক্ষাসত্রে নিয়ে এসেছিলেন, এ থেকেই প্রমাণিত হয় অর্থোপার্জনকেই তিনি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য ব'লে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন নি। শিক্ষাসত্র-প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে কথাটা মনে রাখা উচিত। প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেবের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে, অথবা অহমিকাবশত যদি একে কবির খেয়াল ব'লে অস্বীকার করি, তবে কবির শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেতে বাধ্য।

অবশ্য আমাদের অনেকেরই তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আলোচনা - গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত খণ্ডিত ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই যখন কোনো লেখকের রচিত শিক্ষাচিন্তা-বিষয়কে কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগের দিক নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না, অথবা যখন গ্রামীণ সমাজজীবনে উন্নতির প্রয়োজনে কবি কী চিন্তা-ভাবনা ক'রেছিলেন সে-বিষয়টি কোনো গ্রন্থে অনালোচিত থেকে যায়, তখনও তা আমাদের বিশেষ ভাবনার কারণ হয় না। আমরা সকলেই জানি, এমন অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় কবি স্বয়ং সন্তুষ্ট হতেন না। সেই অসন্তোষের কথা তিনি বারেবারে ব'লেছেন। তবু আজও আমরা সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের অজ্ঞতা এমনই ঔদ্ধত্যপূর্ণ যে আজও শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠার (প্রতিষ্ঠা তারিখ পয়লা জুলাই ১৯২৪) ষাট বছর পরেও কবির প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা জানি না; জানি না গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কবির দরদ ও সহানুভূতি ছিল কত গভীর।

আমরা শহরের মানুষেরা কবির শিক্ষা-চিন্তার তাত্ত্বিক আলোচনা ক'রে হয় তা এড়িয়ে যাই, নাহলে তথাকথিত জনদরদী রাজনৈতিক নেতাদের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে কবিকে 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর প্রতিনিধি ভেবে আত্মসন্তোষ লাভ করি। কলুষিত রাজনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা মনে করি, কবি বুঝি সমাজ-বর্জিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মানুষ, সাধারণ মানুষের জন্য যিনি কিছুই ভাবেন নি। 'নকল শৌখীন মজদুরী' - কে কবি মনে-প্রাণে ঘৃণা ক'রতেন আর আজ যাঁরা সেইজাতীয় কাজে ব্যস্ত তাঁরাই কবিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখানোর অপচেষ্টায় ও

তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যায় অভ্যস্ত। রাজনৈতিক অথবা অন্যতর কোনো ঘোলাটে চিন্তায় আচ্ছন্ন না হ'লে আমরা বুঝতে পারব, কবির শিক্ষাচিন্তার মূলেও আছে মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা। 'মানুষ' ব'লতে শহরের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীই নয়, গ্রামীণ পরিবেশে দেশের যে বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস, তাদের কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে কবি ভেবেছেন। তাই যখন কবি দেখলেন, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে সম্ভব হচ্ছে না, মুষ্টিমেয় শহরবাসী মানুষই তার সুফল ভোগ ক'রছে আর গ্রামের অগণিত সাধারণ মানুষ হচ্ছে বঞ্চিত, গড্ডলিকা প্রবাহের বলে লোকের কিছুটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা কিছুটা চিরকালীন কুসংস্কার তাদের কবি- পরিকল্পিত শিক্ষাগ্রহণে বাধা দিচ্ছে, তখনই আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের (১৩০৮ সনে ৭ ই পৌষ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা) তেইশ বছর পরে কবি এমনই এক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রলেন যেখানে সকলের থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার, যেখানে বিনা বাধায় শিশুর আন্তরশক্তির বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

এই বিদ্যালয়টিই শিক্ষাসত্র - যার বয়স আজ ষাট বছর পেরিয়ে গেছে।

শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন অথবা যাঁরা শিক্ষক তাঁরা সকলেই জানেন, শিক্ষা-চিন্তার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে থাকে এই তিনটি বিষয় :

ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য, যার সঙ্গে দেশ ও কাল যুক্ত। খ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। গ) পাঠক্রম।

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ যখনই এইসব বিষয় নিয়ে ভেবেছেন অথবা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন, তখনই তিনি সম্পূর্ণ মানুষের কথা, অমেয় চিৎ-শক্তির আধার শিশুর কথা ভেবেছেন। পরিপূর্ণ মানবতার চিন্তা যা পারিবারিক শিক্ষার সূত্রে অর্জিত অথবা উপনিষদ্-পাঠের অনিবার্য পরিণাম অথবা এই দুয়েরই রাসায়নিক মিশ্রণ, তা কবির কাব্যে যেমন, তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক ভাবনা-চিন্তাতেও তেমনি সমান গুরুত্ব পূর্ণ। কবির সমকালীন কাব্য তথা সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের সঙ্গে মিলিয়ে প'ড়লেই তা বোঝা যাবে। কবির সমকালীন রচনা : মুক্তধারা (১৯২২) : A Poet's School (১৯২৪) : পূরবী, রক্তকরবী (১৯২৯)। মনস্বী সমালোচকের মতে, '(এ) সবের সঙ্গেই শ্রীনিকেতন ও শিক্ষাসত্রের গভীর ভাবগত আত্মীয়তা আছে।' মানবদরদী তিনি মনুষ্যত্বের অবমাননায় যেমন মর্মাহত হন, তেমনি সেই মানুষকে সত্যকার পথের সন্ধান দেন।

কবির শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা শিক্ষার প্রয়োগগত দিকটির পরিণতি তথা সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে বুঝতে হ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত কবির চিন্তা-ভাবনা স্মরণ করা দরকার। কবি 'শিক্ষার হের ফের' প্রবন্ধে ব'লেছেন : 'যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যেভাবে জীবননির্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতে হইবে, সেই সমাজের কোনও উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতামাতা সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনও স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই, উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না; আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শতহস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে, সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনও একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া

দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনও ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ('শিক্ষার হেরফের', শিক্ষা)।

'শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য-সাধনে'র এই কথাটাই পরবর্তীকালে 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়টিকে সামনে রেখে কবি ব'লেছিলেন এইভাবে :

ক) I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal that I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspects.... (লেনার্ড এলম্‌হার্স্টকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯৩৭)।

খ) The primary object of an institution of this kind should be to educate one's limbs and mind not merely to be in readiness for all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world. (বিশ্বভারতী বুলেটিন ২১ নং। জানুয়ারী ১৯৪৯)

ছাত্রদের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করার প্রয়োজনে অথবা ভাষান্তরে শিক্ষার্থীর জগৎ ও জীবনকে একসুরে বাঁধার কাজে শিক্ষাসত্রের মতো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার আলোকবর্তিকা ব্যতিরেকে দেশের যে বিরাট জনগোষ্ঠী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তাঁদের বাদ দিয়ে যাঁরা দেশহিতৈষিতায় মত্ত হয়ে ওঠেন তাঁদের প্রতি কবির গভীর অশ্রদ্ধা। 'লোকহিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : আমরা লোকহিতের জন্য যখন একটি তখন অনেকস্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি নিজেদেরও হিত করিনা। হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনও অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় — তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

......লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা। ('লোকহিত,' কালান্তর)।

'স্বদেশী সমাজ' নামক বিখ্যাত রচনায় কবি ব'লেছেন : আমরা ইংরেজী শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি - আপনার সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, একথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুলি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছল-বল-কৌশল সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই — কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, একথা আমরা মনেও করি না। পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ('স্বদেশী সমাজ,' আত্মশক্তি)।

কবির মতে, লোকহিত তথা দেশহিতের একটাই পথ আর তা হ'ল শিক্ষা। দেশের অগণিত মানুষকে অজ্ঞ মূর্খ ক'রে রেখে দেশের কোনও হিত-সাধন সম্ভব নয়। আর তাই, কবি-শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে তাদেরই কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন যাদের পরীক্ষা-পাশের কোনও

তাগিদ নেই। তিনি অনুভব করেন, ডিগ্রী লাভের উচ্চাশাহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব। শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে সেদিন যারা কবির শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিল, তারা স্বভাবতই গ্রামের মানুষ। এইসব শিক্ষার্থীদের মানসিক পুষ্টিসাধনে শিক্ষাসত্র সেদিন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রেছিল, তার সম্যক্ মূল্যায়ন আজও হয় নি। অথচ এই মূল্যায়ন ব্যতিরেকে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা-সম্পর্কিত ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। সেদিনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় বা আজকের পাঠভবনকে বাদ দিয়ে কবির শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে গ্রামের জীবন ও গ্রামের মানুষের শিক্ষার জন্য শিক্ষাসত্রের মাধ্যমে কবি যা ক'রতে চেয়েছিলেন তার আলোচনাটা আরও বেশি জরুরী। কারণ 'শিক্ষাসত্র' কবির শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিণত রূপ। একদিকে প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শ আর অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার আদর্শ - এই দুইয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে কবির শিক্ষা-পরিকল্পনায়। তপোবনের শিক্ষার আদর্শ কবিকে অনুপ্রণিত করেছে। সেদিন তিনি অনুভব ক'রেছিলেন জ্ঞানের আলোটি গুরুর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আধুনিক যুগে পুঁথিকে অস্বীকার করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু তাই ব'লে বই মুখস্থ ক'রে পাশ করা তথা ডিগ্রি অর্জন করাটাই শিক্ষার চরম সাফল্য ব'লে কবি মনে করেন না। সকলদিকে পরিপূর্ণ হয়ে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনেই শিক্ষার সার্থকতা। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে শিক্ষার্থীকে প্রধানভাবে সাহায্য ক'রবে গুরুর সান্নিধ্য। আদর্শ গুরুর জীবনযাপনেই শিক্ষার্থীকে সত্যকার পথের সন্ধান দেবে।

স্বভাবতই, রবীন্দ্রনাথের মতে, একালের গুরুকেও প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো অনলস জ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগের দ্বারা ছাত্রদের বিভিন্ন বিদ্যার সাধনায় অনুপ্রাণিত ক'রতে হবে। তবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিলিত প্রয়াসে শিক্ষার একটা যথাযথ আদর্শ পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ থাকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 'ভুত-প্রেত-ওঝা' নিয়ে — তাদের চিত্তোন্নতির প্রয়োজনে চাই বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা। আধুনিককালের গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের অনুন্নত মান, তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হ'লেও সে বিষয়ে আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত যা করা হয়েছে, তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তার দ্বারা গ্রামের মানুষের পরিবেশগত অথবা অর্থনৈতিক কোনও পরিবর্তনই সম্ভব নয়। সত্যদ্রষ্টা কবি-শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ তাই জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর। (দ্রষ্টব্য : 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের 'পল্লীসেবা' শীর্ষক প্রবন্ধ)। কবি যা ক'রতে চেয়েছিলেন তা শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, গ্রামের মানুষ ব'লে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি এই অতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের। বরং শিক্ষাসত্র নামক প্রতিষ্ঠানটিতে যারা প'ড়তে আসবে, তাদের তিনি হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখানোর কথাই বলেছেন:

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন, এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না — গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান। কলম ধরা ছাড়া সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া ক'রে এইটে ঘোচানো চাই। (কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃত। তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ । (দ্রষ্টব্য : 'শিক্ষাসত্র' বিশ্বভারতী ১৯৮৪/সম্পাদনা রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনকুমার দাস)

অন্যত্র লেনার্ড এল্‌মহার্স্টকে লেখা চিঠিতে কবি এই মত প্রকাশ ক'রেছেন :

....Our people need more then anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour which alone can save them from stupid bigotry and moral cowardliness.(Pioneer in Education: Essays and exchanges between Rabindranath and L.K. Elmhirst.)

কবি সেদিন লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নন্দলাল বসু প্রমুখ নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক-কর্মী পেয়েছিলেন যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা 'শিক্ষাসত্র' নামক প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। প্রতিষ্ঠার শুরুতে কোনও সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ইত্যাদি না থাকলেও শিক্ষার্থীর চাহিদামতো বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর পাঠক্রম-ভিত্তিক শিক্ষাদানের কার্যক্রম কালক্রমে গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, পাঠক্রম-প্রণয়নে কবির প্রধান সহযোগী ছিলেন এমন কিছু মানুষ যাঁরা এসেছিলেন হয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে, নয় অন্তরের টানে মহত্তর কর্মের অনুপ্রেরণায়। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৪ সালের পয়লা জুলাই যে বিদ্যালয়ের সূচনা, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ১৯২৫ সালে সেই শিক্ষাসত্র পরিদর্শন ক'রতে এসে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম লক্ষ্য ক'রে মহাত্মা গান্ধী এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রয়োজনে শিক্ষাসত্রের তৎকালীন প্রধান শিক্ষককে ধার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এল্‌মহার্স্ট তাঁর 'Rabindranath Tagore : Pioneer in Education. গ্রন্থে লিখেছেন :

.... Gandhi paid a visit to this school and so impressed that he urged Tagore to loan him the service of the headmaster of Siksha-Satra to help him plan an all-India revolution in primary education. Tagore laughingly volunteered on the spot to be Gandhi's first Minister of Education.

মহাত্মা গান্ধীর Basic Education -এর শুরু ১৯৩৭ সালে। প্রায় তের বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টির কাজকর্ম গান্ধীকে তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকলে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এটা সহজেই অনুমেয় যে, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাসত্রের শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম দেখে এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার দিকটি শিক্ষাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা বিশ্লেষিত ও প্রচারিত হ'লে এই স্বল্প-পরিচিত বিদ্যালয়টিকে অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগ-সম্পর্কিত অনালোচিত এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হতে পারে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে যাঁরা আজও অনবহিত, তাঁরাও রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণার অধিকারী হতে পারেন।

শিক্ষাসত্র : কিছু স্মৃতি

প্রসেনজিৎ সিংহ, প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

'ছিন্নপাতার সাজাই তরণী'

১৯৫০ সনের ৯ আগস্ট শ্রাবণ দিনের এক বৃষ্টিভেজা সকালে ষোল বছরের আমি অনিলদার (চন্দ) নির্দেশনামা সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছোই। ভর্তি হই ক্ষিতিশদার (রায়) স্ত্রী বেবিমাসীর (উমা) সাহায্যে। শিক্ষাভবনের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কলাবিভাগে। অনিলদা তখন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ এবং বিনয়দা (রায়) উপাধ্যক্ষ। বিশ্বভারতীর পরিদর্শক-সভাপতি ছিলেন রথীদা (ঠাকুর)। অনিলদা ও রথীদা ছিলেন আমার স্থানীয় অভিভাবক। বিশ্বভারতী তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৯৫৪ সনে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ সাঙ্গ ক'রে আমি যখন প্রথম ছাত্রাবাস ছেড়ে আর্থিক কারণে স্বনির্ভরশীল হব ব'লে প্রথম চাকরীজীবনে প্রবেশ করি তখন আমার বয়স কুড়ি বছর। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রণজিতের বাবা ধীরা মোসো (রায়) তখন পল্লীসংগঠন-বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি পাঠালেন আমাকে প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য আমারই মাস্টারমশাই প্রাচীন ভারততত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান প্রবোধদার (বাগচী) কাছে। প্রবোধদা তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য এবং জওহরলাল আচার্য।

উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়ীটি ছিল উপাচার্যের দপ্তর। প্রাবোধদা আমাকে পাঠালেন শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের অধীক্ষক সমীরণদার (চট্টোপাধ্যায়) কাছে। এই সহজ প্রক্রিয়ায় খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তিবিহীন অবস্থায় যে অধ্যাপনার পদ সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বভারতীর আশু প্রয়োজনে, সেখানেই আমার চাকরীজীবনের শুরু ১৬ আগস্ট আর-এক বৃষ্টি ভেজা সকালে। ১৯৫৪ -এর আগস্ট মাস থেকে ১৯৫৫ -এর মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলাম শ্রীনিকেতনের খেলার মাঠের পাশে গাছের উপরে তৈরী গুরুদেবের এক আশ্চর্য ঘরে। ধীরা মেসোর স্ত্রী ইতুমাসিমা (গুরুদেবের দেওয়া নাম 'সাগরিকা', তিনি সাগরপারের দেশ জাপান থেকে এসেছিলেন ব'লে) বাবা কাসাহারা ছিলেন সুদক্ষ দারুশিল্পের একজন অগ্রণী শিল্পী। সেই কাসাহারা গুরুদেবের আমন্ত্রণে সপরিবারে এসে বাসা বেঁধেছিলেন শান্তিনিকেতনে। অশ্বথ গাছের শাখাপ্রশাখার উপরে গুরুদেবের জন্য কাঠের ঘরটি তাঁরই গুরুদেবের প্রতি নিবেদন।

'আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খন্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা —'

শ্রীনিকেতন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা পরিদর্শিকা ছিলেন সুনীতি মাসিমা, ডাক্তার মেসোর (অজিতবন্ধু গুপ্ত) স্ত্রী। ১৯৫৪ সনে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি-নির্ধারিত একটি অনুজ্ঞা দ্বারা মূল শিক্ষাসত্রের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয় উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টি। যতদূর মনে পড়ে সমীরণদা ইংরেজী, সহ-অধীক্ষক কালিদাসদা (ঘোষ) বাংলা, সুনীতি মাসিমা অঙ্ক, নমিতাদি (রায়) বাংলা-ইতিহাস, মুকুল মাসিমা সংস্কৃত, অরবিন্দদা (বিশ্বাস) গান এবং সর্বকনিষ্ঠ অনভিজ্ঞ আমি ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, হিন্দি, গান, কিছু ক্লাসে ইংরেজী এবং সর্বোপরি সহপাঠক্রমিক কাজে ব্রতী ছিলাম। পরে যখন অরবিন্দদা বা বিশ্বজিৎদা (রায়) ছিলেন না তখন বেশ কয়েকবছর ধ'রে আমার মাস্টারমশাই শিশিরদার (ঘোষ) তত্ত্বাবধানে শ্রীনিকেতনের বড় উৎসবগুলির যেমন হলকর্ষণ, রবীন্দ্রসপ্তাহ, শিল্পোৎসব, মাঘমেলা ইত্যাদির গান পরিচালনা ক'রেছি। যতদিন না সুশীল (মন্ডল) এসেছেন, ভূগোলও পড়াতে হয়েছিল। কী পড়াতাম জানিনে। কিন্তু যাতে ভুল না পড়াই সেদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল সমীরণদার এবং মাসিমার। সপ্তাহে দিব্যি আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশটি ক'রে পর্ব নিতাম দিনে দুটি পর্যায়ের ক্লাসে। আমাকে পড়াবার ব্যবস্থাও শিক্ষাসত্র করে। এইভাবে ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে এম. এ. ও বি. এড় পড়েছি। অমানুষিক পরিশ্রমের বোঝা নানা রঙের ভেলায় ভাসতে-ভাসতে কখন যে গুরুঋণ শোধের তাগিদে হাল্কা হয়ে আসত, নবযৌবনের স্রোতে তা কখনও উপলব্ধি করিনি। মাস গেলে একশো আশি টাকা আট আনা বেতন পেতাম। মনে হ'ত আমার মতো বিত্তবান আর কেউ নেই।

'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি —'

গ্রাম-থেকে-আসা উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা যে আমার চাইতে বয়সে খুব ছোট ছিল তা নয়। ফলে শান্তিনিকেতনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের আরও নিবিড় সাযুজ্য গড়ে উঠেছিল। ছোট্ট ঘরখানিতে থেকে দু'বেলা ছাত্রদের সঙ্গে রান্নাঘরে একসঙ্গে খাওয়া, রান্না ও বাজার কাজে সাহায্য করা, চারিদিক পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগান করা, ভোরবেলার প্রাত্যহিক বৈতালিকে গান নির্বাচন ক'রে গাওয়ানো, মন্ত্রোচ্চারণ, ক্লাসের পাঠ তৈরী, অধ্যাপনা, কারুর অসুখে সেবা করা, খেলার মাঠে নিয়মিত উপস্থিতি, সান্ধ্যপাঠে ছাত্রদের সহায়তা করা ও রাত্রে পরম নিশ্চিন্তে প্রগাঢ় ঘুম — এই সব নিয়ে নানাবর্ণের দিন কাটত। শিক্ষাসত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা আমার উপরে সহপাঠক্রমিক কাজের দায়িত্ব অনেকখানিই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পাঠভবনের আশ্রম-সম্মিলনীর আঙ্গিকে জন্ম নিলে ছাত্র-রাজতন্ত্রের নির্বাচিত শিক্ষাসত্র ছাত্র-সম্মিলনী। প্রচলিত হ'ল শিশুবিভাগ, মধ্যবিভাগ ও আদ্যবিভাগ। প্রথম-প্রথম মিলিত সাহিত্যসভাই হ'ত, তবে সন্ধ্যায় নয়। কেননা কাছে-দূরের গ্রাম-থেকে-আসা ছাত্রছাত্রীদের সান্ধ্য সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। পাঠভবনের সঙ্গে দু'চারবার মিলিত সভারও ব্যবস্থা হয়েছে। ছাত্রদের জন্য একটি ছোট ছাত্রাবাস ছিল। আর ছিল মঙ্গলবার — জঙ্গল পরিষ্কার করার দিন।

ছাত্রদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে বছরের পর বছর ধ'রে 'সাংস্কৃতিকী' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা। হাতে-লেখা পত্রিকাগুলির নাম মনে নেই। অনেক পরে 'আমাদের লেখা' তে শিক্ষাসত্রের স্থান হয়েছিল পাঠভবনের সঙ্গে। বনভোজন হ'ত কাছাকাছি জায়গায়। একবার আমি ও সুশীল পাণ্ডুয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের। ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে, লেট করিয়ে কামরায় উঠতে হয়েছিল। শিক্ষাসত্রে থাকতে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করাই। অধ্যাপক বন্ধুরা ও কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের ও আমাকে উৎসাহ দিতেন, মঞ্চায়নে সাহায্য ক'রতেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করানো গেল। সুদাম (পাল) ও আগমনী (চক্রবর্তী) প্রধান চরিত্রে রূপ দেন। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় ইভা (ঘোষ) ও জয়শ্রী (গঙ্গোপাধ্যায়), শারদোৎসবে অলীক (রঞ্জন রায়), পঙ্কজ (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং গানে তমাল (প্রভাত পাল) ও ছবি (পাল) বিস্ময়কর অভিনয় ও গান করেন। 'ডাকঘর' নাটকের মূল চরিত্র অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রদীপ (গঙ্গোপাধ্যায়) পরম কুশলতার সঙ্গে। এই তিনটি নাটকই পরপর শারদ-অবকাশের পূর্বে যে নাট্যগুচ্ছ অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে, তার মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষাসত্রে মঞ্চায়ন। যতদূর মনে প'ড়ে আমার শিক্ষাসত্রে থাকাকালীনই আনন্দবাজারে শিক্ষাসত্রের খাবারের দোকান প্রচলিত হয়। ১৯৬৫ সনে আমি পাঠভবনে চ'লে আসি।

বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উঠে-আসা কিছু-কিছু মুখ - আয়াসহীন জিজ্ঞাসা 'প্রসেনজিৎদা নমস্কার। ভালো আছেন তো?' উজ্জ্বল হয়ে আছে, থাকবে। কিছু অকালে-ঝরে-পড়া ফুল, কিছু অতীতের হারানো মুখ, কিছুবা কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর আশপাশের বর্তমান চেহারা - মমতামাখানো ভালোবাসা ও মায়ায় ভরা সেইসব দিন ও সুখের স্মৃতির উদ্দেশে আমি প্রণত হই।

খুঁজে পেয়েছি

বিজয়কুমার দাস, অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

হঠাৎ বাসটা একটা ঝাঁকুনি খেল। তারপর মনে হ'ল যেন নীচু রাস্তায় বাসটা গড়িয়ে চ'লল। কতক্ষণ গড়িয়ে চলেছিল জানিনা। যখন চোখ খুললাম তখন দেখি আমার চারপাশে অনেকে শুয়ে আছে। কিন্তু অমন ক'রে ছিন্নভিন্ন হয়ে শুয়ে আছে কেন। সবাই কি ঘুমুচ্ছে? চোখদুটো একটু মুছে নিলাম। মনে হ'ল সবাই যেন কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে শুয়ে আছে। উঠে বসলাম। আস্তে-আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রলাম। সারা শরীরে ব্যথা। দেখলাম একজন যুবক ছেলে এসে পাশে দাঁড়াল।

ব'ললো : উঠবেন না। আমরা ধ'রছি। গাড়ি এসে যাবে, তাতেই উঠে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম : কী ব্যপার ? সবাই অমনি প'ড়ে আছে কেন?

— পরে সব জানতে পারবেন, এখন এখানেই বসে থাকুন। আমি ওদিকটা দেখি, বাসের নীচেও কেউ থাকতে পারে। ব'লেই সে চ'লে গেল। আমিও আস্তে-আস্তে তার পিছনে হাঁটতে লাগলাম। মনে হ'ল কী ভয়ঙ্কর দৃশ্যই না দেখতে হবে! ছেলেটির কাছে যেতেই দেখি ও আর তার একজন সমবয়সী একজন বাসের কাছ থেকে একটি ছোট ছেলেকে টেনে বের ক'রছে। কোনোরকমে ছেলেটিকে বের ক'রে তাকে একটা জায়গায় শুইয়ে রেখে ছুটল জলের ধারে। জলে নেমে দুজেনে তুলে নিয়ে এল আরো দুজনকে। কারো মুখে কথা নেই, তবে কি তারা অজ্ঞান হয়ে গেছে না ......। দেখি ছেলে দুটো আবার জলে নামল, দুজনে মিলে আবার একজনকে জল থেকে তুলে আনতে চেষ্টা ক'রছে, কিন্তু ওঠাতে পারছে না। আমি এগিয়ে গিয়ে তাদের দিকে হাত বাড়ালাম। অসহায়ের মতো তাদের একজন আমার হাত ধরল, উঠে আসতে পারল। পরে আরও একজনকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে আনল। উঠেই ছেলেটি ব'ললে, স্যার আপনি এ অবস্থায় এলেন কেন?

বললাম : তোমরা এমন কাজ ক'রছ আর আমি তোমাদের একটু সাহায্য করতে পারব না, আমার তো তেমন কিছু হয় নি। আমার মনে আসছে, আমি যে বাসে ছিলাম সেটা হঠাৎ গড়িয়ে যেতে আরম্ভ করে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

একজন ব'ললে : নানতু ঐ যে, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে, ছোট ছেলেটিকে আর কয়েকজনকে আগে তুলে দিই।

চমকে উঠলাম 'নানতু' নামটা শুনে। তাহলে কি ....।

তখন অন্যজন ব'ললে, তোতন, স্যারকেও ঐ সঙ্গে তুলে দিতে হবে।

তখন আরও অবাক হলাম। 'নানতু আর তোতন' এদের আমি অনেকদিন থেকেই খুঁজছি। আর আজ একসঙ্গেই দুজনকে পেলাম!

আমি ব'ললাম : না, আমি ততখানি অসুস্থ নই, চল আমিও তোমাদের সঙ্গে একটু হাত লাগাই। তোমরা দেখছি অনেকক্ষণ ধ'রেই উদ্ধারের কাজ করছ।

একজন ব'ললে : না স্যার, আপনি এখনও ঠিক হ'তে পারেন নি।

ব'ললাম : তোমরা নানতু ও তোতন। তোমাদের ও দুটো নিশ্চই ডাক নাম। তোমাদের আসল নাম দুটো কী বলতো ।

একজন উত্তর দিলে : ও তথাগত আর আমি সৌগত।

আমি ব'ললাম : তোমাদের তো ঐ নাম মনে আসছে। তোমরা তো আমাদের স্কুলেই প'ড়তে ?

ছেলেদুটো এসে প্রণাম করল।

ব'ললাম : চল, গাড়ী এসে গেছে, এখন যতজনকে পারি গাড়ীতে তুলে দিই তারপরে কথা হবে। নানতু, তোতন,

আমি তোমাদের অনেকদিন থেকেই খুঁজছি।

একজন ব'ললে, কেন স্যার ?

আমি ব'ললাম, চলো আগে তোমাদের সঙ্গে হাত লাগাই পরে বলছি।

কয়েকজন আহতলোককে গাড়ীতে তুলে গিলাম আমরা। গাড়ী চ'লে গেল। উল্টে যাওয়া বাসটার কাছে এসে ব'ললাম। — নানতু, তোতন তোমাদেরকে আমি অনেকদিন ধরেই খুঁজছি।

— কেন স্যার?

— তোমাদের একটা ফটো আমার কাছে থেকে গেছে, সেটা ফেরত দিতে হবে তো।

ছেলেদুটো অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। আমি ব'লে চললাম - সে অনেক দিনের কথা। আমি আমাদের স্কুল লাইব্রেরী থেকে একটা বই প'ড়তে নিয়েছিলাম। সেটা প'ড়তে গিয়ে দেখি একটা ফটো তার মধ্যে রয়েছে। দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা, প্যান্ট পরা, প্যান্ট কোমর থেকে ঝুলে পড়েছে। বোকা-বোকা, দুষ্টু-দুষ্টু ভাবে তাকিয়ে আছে। হাসতে চেষ্টা ক'রছে। ফটোর পিছনে নাম লেখা 'নানতু , তোতন'। মনে হল সবে লিখতে শিখেছে। বইটা যখন ফেরতদিতে গেলাম তখন লাইব্রেরীয়ানকে ফটোটাও দিলাম। উনি ব'ললেন 'আমি কোথায় রাখবো ? বই এর ভিতর রাখলে অন্য কেউ তা ফেলে দেবে। বরং আপনার কাছেই রেখে দিন।' আমিও বাড়ি নিয়ে এলাম ছবিটা। যদি কেউ কখনও খোঁজ করে ফেরৎ দিতে পারব। আমার ফটোর অ্যালবামেই রেখে দিলাম। মাঝে-মাঝে ফটোটার দিকে চোখ প'ড়ত, কিন্তু ঐ চেহারার কাউকে চোখে পড়েনি। আবার যদি-বা চোখে প'ড়েছে, তখন নানতু তোতন তো আর ঐ রকম ছোট্টটি নেই, তাই চিনতে পারিনি। আজ তাই একসঙ্গে দুটো নাম 'নানতু আর তোতন' শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু তোমাদের কতদিন ধ'রে স্কুলে পড়িয়েছি, তখন তো তোমরা 'সৌগত আর তথাগত' কী করে চিনব বলো। তোমাদের বাড়ির কেউ হয়তো লাইব্রেরী থেকে বই প'ড়তে নিয়ে ভুল ক'রে ফটোটা বই-এর মধ্যে রেখেছিলেন। আমি কিন্তু তোমাদের খুঁজে পেয়েছি। শুধু তোমাদের নয়, তোমরা যে মানুষ হয়েছ তাও খুঁজে পেয়েছি। কত বকেছি, বোকা বলেছি, পড়া পারনি বলে কত রাগ ক'রেছি। কিচ্ছু হবে না বলে কতবার বকেছি। কিন্তু আজ তোমাদের জন্য মনটা আমার গর্বে আর আনন্দে ভরে গেল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে কত লোক তো দেখলাম চলে গেল, সব দেখেও কেউ সাহায্য ক'রতে এল না, আর তোমরা আহতলোকগুলোর জন্য কত কী ক'রলে! সত্যিই তোমরা বড় হয়েছ।'

— সে তো আপনার জন্যই, মাস্টারমশাই।

— না, আমি তোমাদের পড়িয়েছি শুধু, কিন্তু এতবড় মনটা তোমরা কোথায় পেলে? ওটা তো আমি শেখাতে পারিনি। মুখটা ওদের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলাম, পাছে আমার চোখের জল ওরা দেখতে পায়।

বললাম, নানতু তোতন আবার গাড়ীটা এসেছে, চলো যারা বাকী আছে তাদের গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করি। তারপর আমরা একসঙ্গে যাব। তবে হ্যাঁ, একদিন এসো আমার ঘরে। তোমাদের ছবিটা ফেরত দিতে হবে তো।

— না না, মাস্টারমশাই ওটা আপনার কাছেই থাক। আমরা তো চিনতেই পারব না আমাদের।

— ঠিক ব'লেছ, ওটা আমার কাছেই থাক। তোমাদের তো খুঁজে পেয়েছি।

রবীন্দ্রভাবনার আলোকে শিক্ষসত্র ও সন্তোষ পাঠশালা

মালতী রায়, অধ্যাপিকা, সন্তোষ পাঠশালা

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছিল কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রায় বন্দী অবস্থায়। তাই তাঁর শৈশবস্মৃতি ছিল দুঃখ আর তিক্ততায় ভরা। কৈশোরে স্কুলের শিক্ষার ধরাবাঁধা আনন্দহীন যান্ত্রিক পদ্ধতি কবির মনকে শিক্ষা সম্পর্কে বিমুখ ও বিরূপ ক'রে তুলেছিল। তাঁর কাছে বিদ্যালয় ছিল এক আনন্দহীন কারাগার। কৈশোরের এই মর্মান্তিক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা তাঁর ভিতরকার কবি-সত্তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল এক সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষার আঙিনায় — যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে জন্ম নিল এক অভিনব শিক্ষাচিন্তার। এই শিক্ষাচিন্তাটি শুধু তাত্ত্বিক চিন্তামাত্র ছিল না। তিনি আমরণ এর প্রয়োগক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত ক'রেছেন এবং তাকে শরীরী রূপ দেওয়ার সাধনা করেছেন। তাঁর এই শিক্ষা-সাধনা উদ্ভাসিত হয়েছে এক ঔপনিষদিক প্রজ্ঞায় - 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'। উপনিষদের এই বাণী তাঁর কল্পনার ক্ষেত্রভূমি ছিল। উপনিষদের এই আনন্দ-মন্ত্রটি বাস্তবায়িত হ'ল ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই আশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর শিক্ষা-চিন্তা ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠল বিশ্বভারতীর ভাবনায়। অথচ তখন কবিমন ছিল অতৃপ্ত। কারণ শিলাইদহের অভিজ্ঞতা তাঁকে বারবার পীড়িত ক'রত। সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালী কাব্যে এবং গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করি।

কবিমনের এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে নিয়ে গেছে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির আঙিনায়। গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক গভীর। এখান থেকেই জন্ম নেয় তাঁর পল্লীশিক্ষা-চিন্তা। এই পল্লীশিক্ষা পরিকল্পনায় তিনি শ্রীনিকেতনে চারধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেন :

ক) শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়-স্থাপন

খ) গ্রামীণ কিশোরদের শিক্ষার জন্য 'লোকশিক্ষা সংসদ' স্থাপন

গ) গৃহস্থদের শিক্ষার জন্য 'শিক্ষাচর্চা ভবন' স্থাপন

ঘ) প্রাইমারী শিক্ষক ও কলেজের ছাত্রদের জন্য শিক্ষণ সংক্রান্ত 'ডিপ্লোমা কোর্স' প্রবর্তন।

এই ভাবনাকে সামনে রেখে ১৯২৪ সালের পয়লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়। শিক্ষাসত্র প্রথম থেকেই ছিল জীবনকেন্দ্রিক। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মূল চাবিকাঠি হল গ্রামীণ সমাজনির্ভর বৃত্তিমুখী শিক্ষা। তাই ছাত্ররা আসত গ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে। এই শিক্ষার যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রামের জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। এই শিল্পগুলি তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল :

ক) গৃহশিল্প,

খ) হস্তশিল্প এবং

গ) বহিঃকক্ষশিল্প (প্রয়োজনভিত্তিক ও প্রত্যক্ষভাবে অর্থকরী শিল্প)

শিল্পকাজের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে (ভাষা, সাহিত্য, ভূবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, পরিবেশ-পরিচিতি, স্থানীয় ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি) শিক্ষাদেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রদের সামাজিক পরিবেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণ (ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ কেন্দ্র), থানা, জেল, আদালত, চিকিৎসালয় রেলস্টেশন, মালগাড়ী এলাকা, চালকল, তেলকল, ইটভাটা ইত্যাদি) -এর ব্যবস্থা করা হয়।

এইসব পরিকল্পনা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিক্ষাসত্র যাত্রা শুরু ক'রেছিল। পরবর্তীকালে এইসব পরিকল্পনা কতটা রূপায়িত হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে সকলে এ বিষয়ে একমত হবেন যে আজও শিক্ষাসত্র গ্রামীণ সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। প্রয়োজনে সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে

নেওয়ার তাগিদে এই প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাসত্র তার মূল আদর্শ থেকে কখনই বিচ্যুত হয় নি - একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

'মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা'র মতো একটি Kindergarten শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল শিক্ষাসত্রের অনেকদিনের। যাইহোক, ১৯৮৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রাণপুরুষ, স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নাম-অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'সন্তোষ পাঠশালা'। যদিও এই পাঠশালার নামের সঙ্গে আনন্দ কথাটি যুক্ত নেই - তবে এই পাঠশালায় আনন্দের কোনো অভাব নেই।

রবীন্দ্রভাবধারায় লালিত 'সন্তোষ পাঠশালা' প্রাথমিক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে শিক্ষাসত্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্রমশঃ তার প্রভাব ও গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছে গুরুদেবের এই শিক্ষা-আঙিনায়।

আজ সারা বিশ্বে এক অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে দিন কাটছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে ন্যাটোর বিমানহানা পর্যন্ত এই বিশ্ব এক ভয়াবহ ঐতিহাসিক অরাজকতার শিকার। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত - গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক জীবনের চরম উগ্রতার মাঝে আজও আমাদের প্রত্যয় এই যে, - গুরুদেবের এই তীর্থভূমিতে গ্রামীণ আদর্শ ও সংস্কৃতির একটি দীপ জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এই দীপালোকে আলোকিত হয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও শিক্ষাসত্র ও সন্তোষ পাঠশালার মতো পল্লীশিক্ষা-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আরও প্রতিষ্ঠিত হোক, — তাহলে শিক্ষাসত্র ও সন্তোষ পাঠশালার আদর্শ ও ভাবধারা বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।
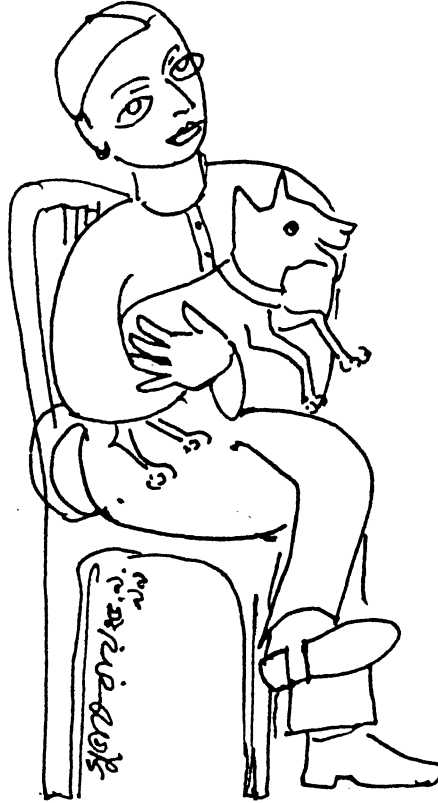
অস্মাকম শিক্ষাসত্রম্

আনন্দময়ী মন্ডল, অধ্যাপিকা, শিক্ষাসত্র

শিক্ষাসত্রম্ ইতি খ্যাতঃ অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ। একদা 'সুরুল - পাঠশালা' ইত্যুচ্যতে। শিক্ষাসত্রম্ পাঠভবনম্ চ বিদ্যালয়দ্বয়ং বিশ্বভারতী - বিশ্বদ্যিালয়ান্তর্গতম্ ভবতঃ। কিং তাৎপর্যপূর্ণং নাম বিদ্যালয়দ্বয়স্য।'পাঠভবনম্ ' পাঠস্য ভবনম্ ইতি বিশ্লেষণং ক্রিয়তে। ভূয়তে অস্মিন্ ইতি ভবনম্। যত্র পঠন - পাঠনায় জনাঃ বসন্তি। অনেন অস্য বিদ্যালয়স্য আবাসিকত্বং সূচিতম্। শিক্ষায়াঃ সত্রম্ ইতি শিক্ষাসত্রম্। সত্রম্ ইতি পদস্যার্থঃ যজ্ঞঃ। জগদ্বিতায় বয়ং সর্বে যজ্ঞকর্ম কুর্ম্মঃ। যজমানস্য শুভকামনায় পুরোহিতেন যাগঃ ক্রিয়তে । কবিগুরুণা রবীন্দ্রনাথেন দরিদ্রমূর্খগ্রামবাসিনাং জ্ঞানদীপপ্রজ্জ্বলায় প্রতিষ্ঠিত - যজ্ঞাগার - বিশেষং শিক্ষাসত্রম্ ইতি কথ্যতে। জনকল্যাণায় বিবিধশিক্ষারূপীযজ্ঞস্যায়োজনং ক্রিয়তে অস্মিন্ বিদ্যালয়শিেষে।

চতুর্বিংশত্যুত্তরেকোনবিংশতি - শততমস্য খৃষ্টাব্দস্য 'জুলাই' ইতি মাসস্য প্রথমে বাসরে কবিগুরুণা প্রতিষ্ঠিতোহয়ং বিদ্যালয়ঃ। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারমহোদয়স্য গৃহে ষড়ভিশ্ছাত্রৈর্বিদ্যালয়স্য পঠন - পাঠন- কার্যমারব্ধম্। সন্তোযচন্দ্রে পরলোকং গতে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিতোহয়ং বিদ্যালয়ঃ। স্বাবলম্বনায় অস্মিন্ বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনং বিনা বিবিধ - হস্তশিল্পশিক্ষাং লপ্স্যন্তে ইতি বিচিন্ত্য গুরুদেবেন প্রতিষ্টিতোহয়ং বিদ্যালয়ঃ ।অত্র ছাত্রাঃ বস্ত্রং বাস্যন্তি, উদ্যানং বিরচয়িষ্যন্তি, কৃষিকর্ম করিষ্যন্তি চ কিন্তু অস্মাকং সমাজস্য ধনিদরিদ্রগতশ্রেণী বিভাগহেতুতয়া ধনিপরিবারাৎ আগতৈশ্ছাত্রৈঃ কায়িকশ্রমমূলককর্মাণি কর্তুং ন ইষ্যন্তে। অভিভাবক - অভিভাবিকা অপি তথৈব চে। তে সর্বে জ্ঞানার্জনায় উপাধিলাভায় চ পুস্তকানি পঠিতুমৈচ্ছন্। পুস্তকস্থাং বিদ্যাং বিনা তস্মিন্কালে সরকারীকর্ম ন প্রাপ্যতে স্ম । অতঃ শিক্ষায়াঃ লক্ষ্যম্ উদ্দেশ্যম চ পরিবর্তনং ক্রিয়তে । যৎ মহতউদ্দেশ্যং গৃহীত্বা শিক্ষাসত্রস্য সূচনা ক্রিয়তে তৎ সংকীর্ণাভবৎ।

একে বদন্তি শিক্ষাসত্রম্ অস্য উদ্দেশ্যাৎ দূরং গচ্ছতি কিন্তু ময়া বক্তব্যম্ শিক্ষাসত্রম্ তস্য উদ্দেশ্যাৎ দূরং নাগচ্ছৎ। যতঃ যুগোপযোগী জীবনোপযোগী শিক্ষায়াঃ প্রয়োজনমস্তি অতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্তনং সাধিতম্। একদা অত্র ছাত্রনিবাসঃ আসীৎ। তত্র বহবশ্ছাত্রাঃ আসন্। বর্তমানে তু অনাবাসিক- বিদ্যালয়রূপেণ পরিচীয়তে অয়ম্। ছাত্রছাত্রীবৃন্দঃ সুদূর-গ্রামাৎ পদব্রজেন দ্বিচক্রযানেন বা আগচ্ছন্তি। পূর্ব্বে অত্র পরীক্ষাপদ্ধতিঃ নাসীৎ পরবর্তিকালে তু পাঠান্তে পরীক্ষাগ্রহণং ক্রিয়তে। প্রয়োজনবোধে বিবিধবিষয়স্য গ্রহণং বর্জনং বা ক্রিয়তে। উদাহরণেন সহ উচ্যতে একস্মিন্ কালে Electrical Servicing and Maintenance ন পঠ্যতে বর্তমানে ইদং গৃহ্যতে। অধুনা চিত্রাঙ্কনং শিক্ষ্যতে। একদা বংশ - বেতস্ মলাক্ষায়াশ্চ শিল্প - বিষয়ে শিক্ষা-লভন্ত। বর্তমানে ইদং শিল্পং ন প্রতিগৃহ্যতে। পূর্বে হস্তশিল্প- শিক্ষার্থে ছাত্রছাত্রীবৃন্দঃ শিল্পসদনমগচ্ছৎ। অধুনা তু বিদ্যালয়াভ্যন্তরে ইদং সাধ্যতে। শিক্ষাসত্রাৎ শিল্পসদনং যাবৎ গমনমপি সময়সাপেক্ষমভবৎ। অপি তু বর্ষাকালে বর্ষণহেতুঃ অতীব কষ্টমনুভবন্তি স্ম ।

অধুনা স্কুল - সার্টিফিকেট ইতি পরীক্ষা প্রচলিতমস্তি। অতীতে ' হাইয়ার সেকেন্ডারী ' ইতি পরীক্ষা আসীৎ। একদা ঐচ্ছিকবিষয়রূপেণ একং বিষয়ং গৃহিতম্। ইদানীং তৎ ' অতিরিক্ত - ঐচ্ছিকবিষয়ঃ' ইতি কথ্যতে।

বিশ্বভারত্যাঃ বিবিধানুষ্ঠানে শিক্ষাসত্রস্য ছাত্রছাত্রীবৃন্দঃ অংশগ্রহণং করোতি। শিক্ষামূলক - ভ্রমণায় বিবিধস্থানে পর্য্যটনং করোতি। বনভোজনাদি - বার্ষিকক্রীড়াপ্রতিযোগিতা - সাপ্তাহিক-সাহিত্যসভা চ অনুষ্ঠীয়তে।

'আমাদের লেখা' ইতি পত্রিকা একদা প্রকাশিতং না ভবৎ। অস্মিন বর্ষে ইয়ং যথাসময়ে আত্মপ্রকাশং করিষ্যতি।

বিদ্যালয়স্যাধ্যাপকাধ্যাপিকা অপি নিষ্ণাতাঃ স্নেহশীলাশ্চ। তে সর্বে যত্নেন সহ শিক্ষালব্ধচিন্তাজাতবিদ্যারত্নং মহাধনং বিতরন্তি। যা বিদ্যা 'দানেন ন ক্ষয়ং য়াতি চোরেণাপি ন নীয়তে।'

'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।

পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ ধর্মস্ততঃ সুখম্।।'

বিদ্যালয়স্য ছাত্রা অপি সুশীলাঃ পাঠে অনুরক্তাশ্চ।

শিক্ষাসত্রমস্যাদর্শাৎ বৈশিষ্ট্যাং চ অদ্যাপি ন শিথীলমভবৎ। অস্য স্বগুণীলস্য কর্মকাণ্ডাঃ শীর্ণাতোয়ধারা ইব প্রবহতি। অস্য প্রতিষ্ঠানস্য মঙ্গলকামনায় সহযোগিতামূলকমনোভাবেন কর্ম ন কুর্ম্মঃ তদা কস্যাপি এককপ্রচেষ্টায়াম্ অস্য বৈশিষ্ট্যং ন জীবিষ্যতি।

बट-बृक्ष

रूपकमल चौधरी, अध्यापक, शिक्षासत्र

लाल लाल फल
उगाता है बट-बृक्ष
कलरव करती चिडिया
उसकी शाखाओं पर
नाचती है उसकी छाया में
छोटी छोटी बालिका
बेखबर दीन-दुनियाँ से
घंटा बजते ही थम जाती है
चलता है पाठ-चक्र
अनेक ज्ञान की बातें
गुजने लगती है
सीमाहीन कक्षा में
कभी समवेत स्वरों में
गुजते है प्रार्थना के मंत्र
आयोजित होती है
साहित्य-सभा, विदाई-सभा
साक्षी है अनेक घटनाओं का
वर्षोसे, शान से,. तनकर खडा
शिक्षा-सत्र का यह बुजुर्ग
बन कर बिशाल वट-बृक्ष।

बुजुर्ग - वयो जेस्ठ

৭৫ বছর আগের শিক্ষাসত্রের একটি দিন: একটি কাল্পনিক দিনলিপি

দেবী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বিনয়ভবন

সকাল হয়েছে, শিক্ষাসত্রের ছোট ছাত্রাবাসটিতে সাত আটজন বালক ঘুম থেকে উঠলো। ঘন্টা বাজেনি, একজন যুবক শিক্ষক, যাঁকে ওরা — দা বলে ডাকে, তিনি নাম ধরে ডেকে ডেকে ওদের প্রায় বিছানা থেকে তুলে আনলেন, ওরে ওঠ্, আর কত ঘুমোবি। ছাত্রাবাসটি গ্রামীণ ধরণের মেটে ঘরের তৈরী (এখনকার শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের উত্তর দিকে কিছুটা জায়গা নিয়ে তৈরী হয়েছিল এই ছাত্রাবাস।) ধারে কাছেই ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র, প্লটে ভাগ করা। একটা ছোট ঘরে কাঠের কর্মশালা, পাশেই একটা তাঁতঘর, কয়েকটা ছোট তাঁত বসানো। ছেলেরা কাজ শেখে। কাঁকর বিছানো রাস্তা, খেলাঘরের পাড়ার মতো মনে হয় জায়গাটাকে। পাশে পাশে ফুলের গাছ, যত্নে বাড়ছে, ফুটছে ফুল। শিক্ষক মশাইয়ের থাকবার ঘর ওদেরই মধ্যে, তাঁর বারান্দার দেয়ালে ঝুলছে ছাত্রদের কাঁচা-হাতেলেখা পত্রিকা, তাতে আছে লেখা আঁকাও আছে, নানা ছবিও আছে। ছোট্ট একটা ভ্রমণ-কাহিনী, জয়দেব-কেন্দুলী বেড়াতে যাবার গল্প। আশ্রমে নিয়ত দেখা পাখীদের ছবি, শালিখ, পায়রা, দোয়েল, ফিঙে। কাঁচা আঁকা হোক, চেনা যায় কোনটা কে।

এখানে ওখানে সুবিন্যস্ত সারিতে বসানো কিছু চারাগাছ। ফলের — যেমন লেবু, পেয়ারা, ফুলের — যেমন চাঁপা, শিউলি - সবাই যত্নে বাড়ছে। সতেজ, প্রফুল্ল।

ছেলেরা উঠে নিজের নিজের বিছানা গুটিয়ে রাখলো। মশারি, বালিশ সবকিছু। কুয়োতলায় গিয়ে বালতিতে জল তুলে নিয়ে পায়খানা সেরে, মুখহাত ধুয়ে খাবার ঘরে গেল একে একে। খাবার ঘর আড়ম্বরহীন, পরিবেশের সঙ্গে মানানো। দুজন কর্মী আছেন রান্না করার জন্য - বাকী সব কাজ এরা নিজেরা করে। সব্‌জী কাটে, ধোয়, বাসন ধোয়, পরিবেশন- সবই। এখন এরা মেঝেতে চাটাইয়ের আসন এনে বিছিয়ে বসল - নিজের নিজের বাড়ী থেকে আনা পিতল কাঁসার ছোট থালা, বাটি বা কাঁসি নিয়ে। আলুভাজা, পেঁয়াজকুচি আর ভিজে ছোলার সঙ্গে মুড়ি মেশানো। মুড়ি এরা সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামের বাড়ী থেকে আনে, গুরুদেব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাড়ী থেকে যা যা মা দেবেন, চাল হোক, মুড়ি হোক, সবজী হোক আনতে পারো কিন্তু টাকা পয়সা নয়। এটি শিক্ষাসত্র, বিনা অর্থব্যয়ে বিদ্যার্জন, শিক্ষালাভ। এর টিনের মুড়ি ফুরোলে ওর টিন থেকে খরচ হবে। সবার ফুরিয়ে গেলে কী হবে? গুরুদেব আছেন, সন্তোষদা আছেন, ব্যবস্থা এখনই হয়ে যাবে।

খাবার পর সামনেই খোলা মাঠ, ব্যায়াম করার সময়। খালি হাতে বেশ কিছুক্ষণ ব্যায়াম। ওদেরই মধ্যে যে বড়, যে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেই পরিচালনা করবে। তারপর নিজের নিজের ছোট ছোট চাষের প্লটে কাজ — মাটি কোপানো, ঘাস পরিষ্কার, সার দেওয়া, জল দেওয়া, যার যেমন দরকার। একটা প্লটে বেগুন গাছে ফুল ধরেছে, প্রজাপতি এসে বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। এ ওকে ডেকে দেখালো। শিক্ষক কাছেই থাকেন, তাঁরও বরাদ্দ একটা প্লট আছে, ওদের চাঞ্চল্য দেখে ওদের কাছে এলেন। প্রজাপতির সূত্র ধরে গল্প করে শেখাতে লাগলেন কেমন করে ডিম থেকে শুঁয়োপোকা, তার থেকে মূককীট, তার থেকে প্রজাপতি হয়। কিছুক্ষণের জন্য ওদেরকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটি দেওয়ালহীন মুক্ত শ্রেণীকক্ষে। একটি ব্ল্যাক বোর্ড দাঁটিয়ে আছে সেখানে কাঠের কাঠামোতে। সামনে মাদুর বিছানো। মাটিমাখা হাতেই সব গিয়ে বসল, শিক্ষক বোর্ডে ছবি এঁকে বোঝাতে লাগলেন কেমন করে মৌমাছি, প্রজাপতি ফুলের পরাগমিলনে সাহায্য করে — ঐ বেগুন ফুলে ফল ধরবে, ফল বাড়বে কেমন করে, এসব কথা।

আবার ফিরে চলো চাষের প্লটে। শেষ হয়েছে কাজ— হাত, পা ধুয়ে চল শ্রেণীকক্ষে। অঙ্ক শেখানো হবে। ফিতে আনা হল। স্কেলকাঠি আনা হল। শরকাঠিতে দাগ কেটে, রং দিয়ে লাইন দিয়ে গজ-ফুট-ইঞ্চির মাপ করা

আছে, সেই কাঠি ওদেরই তৈরী। সেই গজকাঠি দিয়ে বোর্ডটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে বলো কত ফুট কত ইঞ্চি মাপ কোন দিকটার। খুঁটিটার দৈর্ঘ্য মাপো, তোমার প্লটটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে এসো, খাতায় লেখ। তারপর ক্ষেত্রফল শেখা হলো। বোর্ডে স্কেল ধরে লাইন কেটে বর্গফুট বোঝালেন শিক্ষক। ছাত্রদের খাতায় আঁক পড়তে লাগল— বেরিয়ে এলো চাটাইয়ের ক্ষেত্রফল, বোর্ডের, প্লটের, মোরামের রাস্তার, খাতায় কিছু সমস্যা দিলেন শিক্ষক। রাত্তিরে বসে সমাধান করবে।

অঙ্ক কিছুটা শেখার পরেই কবিতার ক্লাশ। গুরুদেবের কবিতা, পূজারিণী। শিক্ষক পড়ে শোনালেন কবিতাটি। তারপর ওদের পড়তে বললেন, তারপর গল্প করে কাহিনীটা শোনালেন। শ্রীমতীর আত্মত্যাগ নিয়ে কথা হল। ওদের মতো করে ওরা সেই কথা বলল ক্লাসে।

এমনি করে বেলা বাড়ে। স্নানের সময় হলো। সকলে দুয়ারে বসে তেল মাখলো। কুয়োতলায় স্নান। তারপর ঘরের পোশাক পরে খাবার ঘরে যাওয়া। নিজেরাই তালপাতার আসন বুনেছে, সেগুলো বিছিয়ে খেতে বসল। দুজন পরিবেশন করে পালাক্রমে। আজ যাদের পালা তারা সবার থালায় থালায় ভাত, ডাল, তরকারি দিতে থাকল। সঙ্গে ডিমভাজা। কোনোদিন মাছ, কোনোদিন ডিম। তবে রোজ মাছ ডিম থাকেনা।

খাবার পর থালা মেজে ধুয়ে ঠিক জায়গায় রেখে ঘরে যায় ওরা। দুপুরে ঘুমোবার নিয়ম নেই। শিক্ষক খাওয়া সেরে এলেন ওদের ঘরে। একটা বড় ঘর, সেখানেই সবাই বসে। কমনরুমের মতো। শিক্ষক বললেন, দেওয়াল পত্রিকার এমাসের লেখার সংগ্রহ করো সবাই। আশ্রম বিদ্যালয়ের (পাঠভবন) শিক্ষকদের কাছ থেকেও নেবে। গুরুদেবের কাছে যাবে, যা লিখবেন তাই নেবে। পত্রিকার নামটা ওঁর ভালো লেগেছে। 'চেষ্টা'। নামটা ভালো করে লিখবে।

গতকাল আমরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলাম? গোয়ালপাড়া পেরিয়ে কোপাই নদী। সবাই সেই ভ্রমণের কথা লিখবে। যারটা ভাল হবে, পত্রিকায় দেওয়া হবে।

আজ বিকালে ফুটবল খেলা হবে। আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের। চারটের সময় সবাই মাঠে চলে এসো। গুরুদেব বলেছেন এইভাবে দুই বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

খেলা হলো, সে কী উত্তেজনা। শিক্ষাসত্র একগোলে জিতলো। সন্ধ্যেবেলা আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করলো। তারপর ওদের রান্নাঘরে এদেরও খাবার নিমন্ত্রণ।

খাবার পর শিক্ষাসত্রের ছাত্রাবাসে এলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। মাঝে মাঝেই আসেন— খেলাচ্ছলে এদের শেখান কত সহজে, কত অল্প রেখায় কাগজে, শ্লেটে, দুয়ারে বালির উপর ছবি ফুটে ওঠে। নকশা, ফুল, পাতা, পাখী কত কী। ছেঁড়া কাগজ জুড়ে জুড়ে কেমন সব চিত্র বিচিত্র অদ্ভুত ছবি তৈরী করা যায়, তা দিয়ে গল্প বানানো যায় — এসব।

দেয়ালঘড়িতে দশটা বাজলো। শিল্পী উঠে পড়লেন — সকলকে শুয়ে পড়তে বললেন।

সন্তোষদা ওদের ঘরে এসে আগামীকালের কর্মসূচী বলে গেলেন। সকালে উঠে টিফিন খাওয়ার পর সবাই ভুবনডাঙ্গায় যাবো। গ্রামের রাস্তায় মোরাম মাটি ফেলার কাজে আমরা অংশ নেবো। ঝুড়ি কোদাল গামছা তৈরী আছে।

ফেলে আসা মোর দিনগুলি

সুবোধ মিত্র, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষাসত্র

১৯৫৬ সালের বোধহয় ১ লা জুলাই বাবার হাত ধরে শিক্ষাসত্রে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার বয়স তখন দশ বছর। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বাড়ী ছেড়ে ছাত্রাবাসে থাকার ব্যাপারে বেশ ভয় পেয়েছিলাম এবং খুব কান্না পেয়েছিল। কান্নাটা থামতে দিন পনেরো সময় লেগেছিল। আমাদের স্কুলটা তখন বর্তমানে যেখানে শিক্ষাচর্চা সেখানে ছিল। বর্তমানে দোতলা ছাত্রাবাসগুলি তখন একতলা ছিল। আমরা একতলা ঘরগুলোতেই থাকতাম।

প্রথম দর্শনেই যাঁকে আমরা 'মা' বলে মনে করেছিলাম সেই 'মাসীমা' প্রতিনিয়ত আমাদের ছাত্রাবাসে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে, চুমু খেয়ে আদর করতেন, হাতে পায়ের নখ কেটে দিতেন, বিছানা কি করে গুছিয়ে রাখতে হয় তা শিখিয়ে দিতেন। মাসীমার প্রতি আমাদের আবদার দিন প্রতিদিন বেড়েই চলত আর উনি সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করতেন। এই স্নেহভরা নিবিড় সম্পর্কে আমাদের বাড়ী ছেড়ে থাকাটা মনেই হত না। এ ছাড়াও বড় দাদারা সব সময়েই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকতেন। কখনও মনে হয় নি আমরা আলাদা। প্রত্যেকেই মনে করতাম যেন আমরা এক পরিবারের সদস্য। আমাদের কাছে পড়াশুনা ছিল মজার ব্যাপার - কোনো চাপ ছিল না। শিক্ষকরা গল্প দিয়ে শুরু করতেন। ক্লাসের মাঝে হাতে-কলমে, আবার কখনও বা ধান ক্ষেতে, কখনও খোয়াইয়ে কিংবা নীল আকাশের নীচে হত প্রকৃতিকে চেনা-জানার মধ্য দিয়ে পাঠ।

আমরা পেয়েছিলাম অসাধারণ গুণ সম্পন্ন শিক্ষকদের। যাদের ঋণ শোধ করার কোনো সুযোগ আমরা কোনোদিনই পাব না। শিক্ষাসত্রের সেদিনের আবহাওয়ায় ও শিক্ষকদের লালন পালনে বড় হয়েছি - প্রকৃতি পরিবেশকে জেনেছি, যা আমাদের জীবনে মহামূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

আমরা পেয়েছিলাম সমীরণদা কে (প্রয়াত সমীরণ চট্টোপাধ্যায়) শিক্ষাসত্রের অভিভাবক (রেক্টর) হিসাবে। সমীরণদা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চোখের দিকে কেউ তাকাতে পারতো না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলার সাহস আমাদের কারও ছিল না। অন্যদিকে আবার সমীরণদাকে আমরা ভীষণভাবে ভালবাসতাম।

দুটো ঘটনার কথা বললে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বোঝা যাবে। আমাদের স্কুল তখন ডেয়ারির পিছন দিকের মাটির ঘরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। সবেমাত্র আমরা ওখানে গেছি। ঠিকাদাররা জলের পাইপ লাইন ও চৌবাচ্চা তৈরী করছিলেন। অজিত (বন্দ্যোপাধ্যায়), পরিমল (নন্দী) আর আমি মিলে ঠিকাদারের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রতিবাদ করি কিন্তু ঠিকাদার আমাদের কথা না শুনে সিমেন্ট কম দিয়ে চৌবাচ্চাগুলি তৈরী করতে থাকেন। আমরা রাত্রে ঐ চৌবাচ্চাগুলি ভেঙ্গেফেলে মাটি ভরে দিই। পরেরদিন হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। সমীরণদা আমাকে ডেকে পাঠালেন। কারণ আমি ছিলাম এইসব কর্মকান্ডের নেতা। সমীরণদা জিজ্ঞাসা করতেই স্বীকার করলাম। তিনি আমাদের শাস্তি দিলেন যে দিনের বেলা আমাদেরকে চৌবাচ্চাগুলি থেকে মাটি তুলে ফেলতে হবে। ভীষণ খারাপ লেগেছিল মাটি পরিষ্কার করতে, কিন্তু পরদিন থেকে ঠিকাদারদের কাজের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হল আমাদের উপরেই। নতুন দায়িত্ব পেয়ে গর্বে আমাদের বুক ফুলে গিয়েছিল।

আরেকটি মজার ঘটনার কথা বলি। আমরা তখন বোধহয় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। সমীরণদার বাসস্থানটি ছিল আমাদের হোস্টেলের খুব কাছেই। একদিন দেখলাম সমীরণদার বাড়ীর রান্নাঘর থেকে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ আসছে। আমি ব্যাপারটি বন্ধুদের গিয়ে বললাম। ঠিক করলাম ভাজা মাছগুলো যেমন করেই হোক আমাদের হাতাতে হবে। আমরা পাঁচজন মিলে একটা প্ল্যান করলাম। আমি দৌড়ে গিয়ে বৌদিকে বললাম যে সমীরণদা অফিসে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বৌদি রান্নাঘর ছেড়ে অফিসের দিকে ছুটলেন। ঐ ফাঁকে আমি, ভটু (সমীরণদার শ্যালক), রামগোপাল ভাজা মাছের ঝুড়ি নিয়ে শুরুসায়েরের পাড়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে মাছগুলো খেয়ে ফেললাম।

সন্ধ্যেবেলা আমাদের ডাক পড়ল সমীরণদার বাড়ীতে। ভয়ে ভয়ে গেছি। বৌদি ভীষণ রেগে গজরাচ্ছেন। সমীরণদা বললেন, 'শোনো, এদের মিষ্টি দাও'। বৌদি রেগে বলে উঠলেন, 'এই জন্যই তো ছেলেগুলোর এই

স্বভাব'। সমীরণদা হেসে পাশে বসিয়ে পেটভরে খাওয়ালেন। এইরকম ছিলেন আমাদের সমীরণদা।

সমীরণদা ছিলেন একজন রবীন্দ্রভক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতা আন্দোলনে সমীরণদার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। আমরা তাঁর কাছে ইংরাজী পড়তাম। কখনও মনে হত না আমরা পড়ছি অথচ দেখতাম অনেক নতুন নতুন জিনিস জেনে ফেলেছি। শিক্ষাসত্র ওনার অভিভাবকত্বে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান বলে মনে হত।

হোস্টেলে আমরা নিজের কাজ নিজে করতাম। রান্নাঘরে পরিবেশন ও রান্নার পালা পড়ত। ফলে রান্নার প্রথম পাঠ এই রান্নাঘরেই পেয়েছি। আমাদের বেশীরভাগ ছেলে খুব ভাল রান্না করার ব্যাপারটি রপ্ত করে ফেলেছিল। ফুল ও সব্জীর বাগান আমরা নিজেরা করতাম। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ফুলগাছ আমরা লাগিয়ে তার পরিচর্যা করতাম। ফলে সমগ্র পরিবেশটি নানান ফুলে সারা বছর মেতে থাকত। ফুল ও গাছের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা প্রকাশ পেত তাকে আরও সুন্দরভাবে পরিচর্যা ও লালন পালন করার মধ্যে দিয়ে। এইভাবে সৌন্দর্যবোধ ছোটবেলা থেকেই একটা স্বাভাবিক গতি পেত। হোস্টেলের সব্জী বাগান ছিল দেখবার মতো। লাউ, কুমড়ো থেকে আলু, কপি, মটরশুঁটি কি না ফলত আমাদের বাগানে। ছাত্র শিক্ষক সবাই মিলে আমরা সব্জী বাগান করতাম। কি ভাল লাগত! শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে গুরুদেব যে ফুল ফলের গাছের অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের মধ্যে গভীরভাবে নেশার মতো ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল।

সারা শ্রীনিকেতনে শিক্ষক ও কর্মীদের বাসস্থানগুলি সারাবছর মনমাতানো ফুল-ফল-গাছে ভরে থাকতো। যাঁরা বাইরে থেকে আসতেন তাঁরা অবাক দৃষ্টিতে এই রূপকে উপভোগ করতেন। ভাবতে কষ্ট লাগে সেই রূপ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

লেখা-পড়া হতো অজান্তে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ও পাঠের মধ্যে দিয়ে। হাতের কাজ, প্রকৃতি পাঠ, খেলাধুলো রান্নাঘরের পালা কিংবা সাহিত্যসভা সবই ছিল পড়া জানা ও শেখার অঙ্গ। আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তীকালে মানুষ হিসাবে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে।

আমাদের সময়ে দুবেলা ক্লাস হত। সপ্তাহের শেষ ক্লাসটি ছিল এ্যাসেমব্লী বা সাহিত্যসভা। এই সভাতে বহু জ্ঞানীগুণীজন উপস্থিত থাকতেন।

নাটক-গান-সাহিত্যচর্চা- হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশনা করার প্রবণতাগুলো এইসব পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছিল। ফলে সৃজনশীল মনগুলো প্রকাশ করার যথেষ্ট সুযোগ আমরা পেতাম। আমাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর - সরল - সাধাসিধে। আমাদের সময়ে শিক্ষক হিসাবে যাঁদের পেয়েছি ও যাঁদের লালন-পালনে বড় হয়েছি তাঁরা যে কি ভালবাসতেন তা মনে হলে আজও মনটা পুরানো দিনগুলোতে ফিরে যেতে চায়। শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কালিদাসদা আমাদের বাংলা পড়াতেন। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন অসাধারণ। আমরা পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় সুনীলদাকে, শ্রদ্ধেয় প্রসেনজিৎদাকে। শ্রদ্ধেয় সুকুমারদা আমাদের অঙ্ক করাতেন — কল্পিকাদি সংস্কৃত ক্লাস নিতেন। অরবিন্দদা (বিশ্বাস) গান শেখাতেন আর নমিতাদি আমাদের প্রকৃতিপাঠের ক্লাস নিতেন। ধনঞ্জয়দা ও গীতা বৌদির কাছে খেলাধূলা ছাড়াও অঙ্ক করতাম। পরবর্তীকালে শেষের দিকে প্রয়াত ব্রজদা, শ্রদ্ধেয় সতীনাথদা, দর্পনারায়ণদা-সরোজদা, বঙ্কিমদা, পরমেশদা (আচার্য) কাছে পড়েছি।

শ্রদ্ধেয় শিশিরদা অর্থাৎ শিশির বসু আমাদের ইংরাজী পড়াতেন। আমাকে শিশিরদা প্রথম মার্কসবাদে দীক্ষিত করেন।

শিক্ষাসত্রে আমার আটটা বছরের স্মৃতি শেষদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। শিক্ষাসত্রের এই পরিবেশই আমাদের মধ্যে বহু প্রতিভাধর সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সমাজসেবী-শিক্ষাবিদ্ তৈরী করতে পেরেছে যা গর্ব করার মতো।

গত ৭৫ বছরে বহু প্রতিভার বিকাশে শিক্ষাসত্র যে ভূমিকা নিয়েছে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রাক্তন ও বর্তমান সবার উপরেই রয়েছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সেদিনের শিক্ষাসত্র এবং সতীর্থ

বিশ্ববিজয় রায়, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষাসত্র

১৯৫৭ সাল। নয়া পয়সার প্রবর্তন। আমার শিক্ষাসত্রে প্রবেশ ছাত্ররূপে। যার শেষ ছিল ১৯৬৪ তে। তখন ক্লাস হতো সকাল-বিকাল, দু-বেলায়। ক্লাস হতো ডেয়ারীর পাশের আমবাগানে। শিক্ষাসত্রের অফিস ছিল বটতলার বর্তমান স্টাফ কোয়ার্টারে। হস্টেল চলতো পুরোদমে। রান্না ব্যতীত অন্যান্য কাজ নিজেদেরই করতে হতো। প্রতি মঙ্গলবার সমস্ত ক্লাসের এসেমব্লী হতো পঞ্চম পর্বে। ঐ সভায় বেশীরভাগ দিনই বিশিষ্ট কেউ অথবা উপাচার্য মশাই উপস্থিত থাকতেন। আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্র একবেলা হস্টেলে থাকতাম। আমাদের ছাত্রাবাসের গৃহটির নাম ছিল 'গৌরগোপাল গৃহ'। তখন 'কল' ঘোরালেই জল পাওয়া যেত না। কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করতে হতো এবং পালা করে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন 'বড়কাজ' অর্থাৎ পায়খানা পরিষ্কার করার কাজ করতে হতো। না করতে পারলে ক্যাপ্টেনের লাঠি পেটানি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

আমার সতীর্থ ছিল, একই ঘরে, শ্রীসুবোধ মিত্র, শ্রীপুলিনবিহারী নন্দী এবং শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী। এদের মধ্যে আমি ও প্রশান্ত ছিলাম একবেলার হস্টেলার। অতএব দুজনের জন্য বরাদ্দ একখানি খাট। একটুখনি বিশ্রামের জন্য। ভাত খেয়ে জায়গা পরিষ্কার করে থালা ধুতে হতো আমাদেরকেই। সেই সময় C.I.T এর সঙ্গে শিক্ষাসত্রের কোনো বিরোধ চলছিল, যা আমাদের মতো অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। সময়টা ছিল ১৯৫৯-৬০ সাল। ভীড় এড়াতে আমি আর প্রশান্ত একদিন এঁটো থালা C.I.T এর কুয়োতে ধুয়ে ফিরছি, ঘরে ঢুকবো এমন সময় ক্যাপ্টেন রবি দত্ত (উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পৌত্র) ডেকে পাঠালেন তাঁর হস্টেল গৃহ থেকে বেশ হুঙ্কার দিয়ে, 'এ্যাই, এদিকে শোন্'। গিয়ে দাঁড়িয়েছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। ধমকে বললেন, 'হাত পাত'। সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতা মাত্র লাঠির ঘা। বিদ্যুৎ চলার মতো গোটা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। আর চোখে অনিবার অশ্রু। হয়তো তাতেই রবিদার সন্তুষ্টি হয়েছিল। কিন্তু প্রশান্তকে একাধিকবার বেত্রাঘাত করেছিলেন হয়তো ওর অশ্রু বিসর্জনে বিলম্বের ঘটেছিল। পরে বুঝেছিলাম ওখানে যাওয়াটি ছিল শিক্ষাসত্রের ছাত্রের কাছে অপমান। এতো গেল ক্যাপ্টেনের —

শিক্ষকমশাইএর টি অনুরূপ একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ফলশ্রুতি। আমার সতীর্থ শ্রীপুলিনবিহারী ছিলেন ওপার বাংলার দুঃস্থ ছাত্র। কিন্তু বিশ্বভারতীর অনুদানেই পড়াশোনা চালাতো। তখন সবাই কেমন অন্য চোখে দেখতো। জামা কাপড় পরিষ্কার করা, চুল কাটা ইত্যাদির জন্য ব্যয়ভার বহন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্যই ছিল। এখানে এক দূরসম্পর্কের মাসীমা তার খোঁজখবর মাঝেমধ্যে নিতেন, আর কেউই তার ছিল না। একদিন ওর 'চুলকাটা'র দায়িত্ব পড়ল আমার আর সুবোধের ওপর। দায়িত্ব দিয়েছেন সরাসরি সমীরণদা। তৎকালীন রেক্টর। যাকে বলে অধ্যক্ষমশাই। গৌরগোপাল গৃহ'র সামনে নিমতলায় প্রাকস্নান পর্বে দুটি কাঁচি, দুটি চিরুণী এবং একটি কাঠের ফ্রেমে মোড়া ও কাঠের ও কাঠের ঢাকনা লাগানো আয়না নিয়ে উভয়ে পুলিনকে ডাকলাম চুল কাটার জন্য। পুলিন নোংরা গামছাটি প'রে ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে বসলো। দুজন দুদিক থেকে কাঁচি চালাতে শুরু করলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের মতো চুল। বহুদিন তো কাঁচি পড়েনি। মনের আনন্দে কাঁচিও চলতে লাগলো। তারপর দেখি আমার দিকটা অনেক উপরে উঠে গেছে। সুবোধ দায়িত্ব নিয়ে ওর দিকটা সমান করে নেওয়ার চেষ্টা করলেও - অনেকটাই বেশী টিকির কাছ পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল। আবার আমাকে অগত্যা টিকি বরাবর সমান করে কাটতে হলো। দেখতে দেখতে পুলিন একটি কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হল। আমরা ওকে দেখে হেসে ফেলেছি। পুলিন বুঝতে পেরে আয়না দেখতে চাইলে। তখন সুবোধ বুঝে গেছে যে আমরা খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটি ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল। স্নানের পর্বে সকলে পুলিনকে দেখে- আর হো হো করে হাসে। সে অত্যন্ত অপমানিত হয়ে পাশেই সমীরণদার কোয়ার্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ অবস্থা কে করেছে'। ক্রন্দনরত পুলিন শুধু আমাদের এসে বলেছিল, 'যা এক্ষুনি তোরা দুজনে সমীরণদার সাথে দেখা করগে।' ভাতটা খেয়েই গিয়েছিলাম। দরজার সামনে দাঁড়াতেই খেজুরের ছড়ি হাতে সমীরণদার বেত্রাঘাত। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ। উঃ সেকি জ্বালা মনে হচ্ছিল পুলিনের গোড়া মোটা, কাটা চুলের তীক্ষ্ণ ফোঁড়। তারপরেও পরিত্রাণ নেই। অন্য শাস্তিস্বরূপ উভয়ে মিলে পাঁচআনা জোগাড় করে সমীরণদার নির্দেশে পুলিনের চুলকাটা-মাথাটি শ্রীনিকেতন বাজার থেকে সম্পূর্ণ কেশমুক্ত করিয়ে এনেছিলাম।

জানি না আজ সেই সতীর্থ বন্ধু পুলিনবিহারী কোথায়। থাকলে সেদিনের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারতাম। আর একবার শিক্ষাসত্রের সেদিনের আবহাওয়ায় নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম।

স্মৃতিচারণ

শিশির বসু, প্রাক্তন অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

আমি ১৯৫৪ সালের ৬ ই নভেম্বর বাঁকুড়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল থেকে শিক্ষাসত্রে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিই। তখন আমার শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এর উদ্দেশ্য বা প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধেও আমার সম্যক কোনো জ্ঞান ছিল না। শুধু এইটুকু বুঝতাম যে শিক্ষাসত্র তাকেই বলে যেখানে শিক্ষা দান করা হয়। শিক্ষাসত্রে এসে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার সম্যক জ্ঞান হয়।

শিক্ষাসত্রে যোগ দিয়ে জানতে পারি স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গ্রামের কচি কচি ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা ও নানাবিধ হাতের কাজ শেখানোর মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে তাদের ভিতরের যে গুণাবলী প্রচ্ছন্ন আছে তার প্রকাশ করার প্রেরণা জাগান। আমি শিক্ষাসত্রে যোগ দিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশে তাদের শিক্ষাদান করি। তখন শিক্ষাসত্রের প্রত্যেক ছাত্রকে একটি করে প্লট দেওয়া হত। চাষ করে ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে। এর ফলে ছাত্রদের মনে দারুণ কৌতুহল ও তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও জাগত। প্রথম প্রথম আমাদের রেক্টর স্বর্গত সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে আমরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশে ইস্কুলের চারিপাশ পরিষ্কার করতাম। বর্ষাকালে মেঘলা দিনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া হত, সাধারণত হেঁটে হেঁটে এবং ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে বনবীথিকার মধ্যে দিয়ে আমার-কুটীর বেড়াতে যেত। কি ভালই না লাগত! শিক্ষাসত্রে তখন হস্টেল ছিল। সেখানে কাছাকাছি গ্রামের ছাত্ররা থাকত। মেয়েরা সাধারণত সুরুল থেকে আসত। গান্ধী-পুণ্যাহে আমরা শিক্ষাসত্রের চারপাশ পরিষ্কার করতাম। দুপুরে সুরুল গ্রামের ছাত্রীরা অধ্যাপিকা গুপ্তা'র (আমাদের শ্রদ্ধেয়া স্বনামধন্যা মাসীমা) তত্ত্বাবধানে বামুনঠাকুরকে ছুটি দিয়ে হস্টেলের ছাত্রদের জন্য রান্না করত। শারদোৎসবের সময় শ্রদ্ধেয়া সুনীতি গুপ্তার পরিচালনায় একটি নাটক হতো। তা ছাড়াও বছরে একবার করে বনভোজনও হতো। রান্নার ভার ন্যাস্ত থাকতো মাসীমার ওপর বর্তমানের শিক্ষাসত্র বিরাট মহীরুহের ন্যায় বিস্তৃত হয়েছে।

এ বছর শিক্ষাসত্রের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষের সমাপ্তি মহাসমারোহে পালিত হয়। এ বছরের ১ লা জুলাই, আমরা যারা পুরানো শিক্ষক, সকলকে সম্মানিত করা হলো। শিক্ষাসত্র ভোলার নয়। আমার বহু স্মৃতি বিজড়িত শিক্ষাসত্র আমার অন্তরে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

— অনুলেখন : রোহন দাস, শিক্ষাসত্র

সেই বাড়ীটি

খুসী সরকার, প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষাসত্র

পূর্বাহ্নের পর কালো নিকষ
নিশীথে নিভু নিভু তারারা —
নীলিমার অঞ্চলে
অর্থের স্বাধীনতায়
আমি স্ব-নির্ভর —।
ঘুমচোরা চোখে
একা জেগে আছি।

স্বার্থপরতার আটপৌরে মোড়ক,
তোলা মানবিকতার
পোশাকী হাতছানি —
আমি আছি, শুধু
আছি মনে হয়।

উপরে ওঠার
উন্মত্ততা —
চরৈবেতির দমামায়
যখন হৃদয় খান খান-
বাস্তবে, রাক্ষসের মুখের
গহ্বরে আমি।

ঠিক তখনই মা নেই ?
কেউ নেই !

গলায় চাপা কান্না নিয়ে —
শুকিয়ে যাওয়া তন্তুতে
রস নাই।
অ-সার পড়ে আছি
ঠিক তখনই বাল্যকালের ইতিহাসে
স্কুল বাড়ীটার ছাওয়ায়
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে
বেঁচে উঠি।

মহাশূন্যেও অতীতটাই
আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়।

মাকড়সা

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষাসত্র

জানালার বাহিরে যামিনী তমসাচ্ছন্না, কিন্তু জানালার ভিতরে আমার পড়ার ঘরখানি আলোকপ্লাবিত। 'পি. কে. দে সরকার ' - অনেক কষ্টে বিছানার উপর আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু পাঠক উর্ধ্বমুখে চিন্তারত।

পোকা - তাহারা কোথা হইতে আলোকের সন্ধানে তড়াং তড়াং করিয়া আসিয়া ঘরের ভিতর পড়িতেছে। পাঠকের সে দিকে দৃষ্টি নাই। উর্ধ্বে বিজুলি আলোর দণ্ডখানি বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য আলোক বর্ষণ করিতেছে।

আলোক দণ্ডের ঠিক নিচেই আমার আঁখি যুগল ন্যস্তছিল। সেই স্থানে অতি সুন্দর, অতি সুনিপুণ রূপালি রঙের সূক্ষ একটি জাল শূন্যমার্গে প্রায় অদৃশ্য হইয়া ঝুলিয়া আছে। একটি ছোট সবুজ রঙের ফড়িং সেই রূপালি জালে হাত পা আটকাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। জালখানি গোলচক্রাকৃতি এবং বহুদুর বিস্তৃত এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে, জালের সবকয়টি প্রধান রশ্মি একত্রে ধরিয়া, লম্বা লম্বা আটখানি বাহু বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে এক মুশ্‌কো মাকড়সা।

অনেকক্ষন এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সহসা মাকড়সাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম ' কি হে বাপু আর দেরি কেন ? এবার পোকাটাকে টানিয়া আনিয়া টুঁটি চাপিয়া ধর ।' মাকড়সা তাহার লম্বা লম্বা পায়ের উপর ভর দিয়া একটু দুলিয়া উঠিয়া বলিল - ' দাঁড়াও, এত তাড়া কিসের, এতো সবে একটা' । প্রশ্ন করিলাম ' কেন আরো শিকার জালে পড়িবে আসা কর ?' মাকড়সা বলিল ' পড়িবে মানে, আরো গাদা গাদা পড়িবে । ঐতো বাঁদিকের উলুবন হইতে আলো দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছে একটা সাদা মথ, ঐতো আমগাছের কোটর হইতে উচ্চিংড়া লাফ মারিল। ঐতো কঙ্কে গাছের ঝোপ হইতে গঙ্গাফড়িং ডানা মেলিয়া বাহির হইল, - উহারা সবাই আসিতেছ আলো দেখিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, উড়িয়া উড়িয়া আসিতেছে, আরো আসিবে। উহাদের মনে বড় আনন্দ, বড় ফুর্তি, বড় আশা বুঝিলে ভাই, সব উলুবন ঘেঁটুবন হইতে আসিতেছে কিনা তাই। ওরা ভাবিতেছে নিয়ন লাইটের আলো পাইবে, ঝকঝকে তকতকে ঘরটি পাইবে, বিজ্ঞাপনের ছবির মতন খাদ্য বস্তুও সেখানে নিশ্চয় প্রভূত পরিমানে সাজান থাকিবে, আহা ! আহা উহারা কতই না লাভবান হইবে। কিন্তু ভাই উহারা কেহই জানেনা যে, যেই স্থানে আলোক উজ্জ্বল হইয়া আছে, আলো হাতছানি দিতেছে, সভ্যতা আহ্বান জানাইতেছে, সেই স্থানেই আমি আমার অদৃশ্য জালখানি পাতিয়া বসিয়া আছি। কোনো ব্যাটাকে উহা পার হইতে হয় না, সকলকেই আসিয়া শেষ পর্যন্ত এইখানে আটকা পড়িতে হয়।'

সবুজ পোকাটা নির্বোধের মত আর একবার আলোক দণ্ডের দিকে মুখ তুলিয়া ছটফট করিয়া উঠিল। মাকড়সা দুলিয়া দুলিয়া গর্ব্বের হাসি হাসিতে লাগিল। আমি প্রশ্ন করিলাম ' ভাই মাকড়সা তুমি এইরকম ভাবে আমার সুন্দর সাজান গোছান ঘরখানিতে বড় বড় জালপাতিতেছ, দুদিন বাদে এটিকে কি আর সভ্য লোকের নিবাসস্থল বলিয়া মনে হইবে ?' মাকড়সা বলিল 'চাহিয়া দেখ দেখি আমার জালগুলি কি খুবই কুৎসিৎ বলিয়া মনে হইতেছে।' দেখিলাম, না সভ্য যুগের আলো মরণ ফাঁদগুলির উপর বেশ খানিকটা রূপালি পালিশ মাখাইয়া দিয়াছে, ফলে তাহাদের কুৎসিৎ তো লাগেই না বরং আরো তাহারা মনমুগ্ধকর হইয়া উঠিয়াছে। মাকড়সা বলিল - ' এ তোমাদের ভুল ধারণা বন্ধু। ভাঙাচোরা হানাবাড়ীর ভিতর মাকড়সা জাল পাতিত বটে, কিন্তু তা এ যুগে

নহে সেইদিন বহুকাল পার হইয়া গিয়াছে। এখন মাকড়সারা ড্রইংরুমে বসিয়া সিলিংফ্যানের হাওয়া খাইতে খাইতে মার্ফি রেডিওর গান শুনিতে শুনিতে, জালে টানাদেন। সেগুলিকে আর তোমরা ঝুলঝাল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারিবেনা। দেখিবে হাওয়া গাড়ীতে হাওয়া খাইতে খাইতে, বিলিতি রেস্তঁরায় নাচ দেখিতে দেখিতে মাকড়সারা জালে টানা দিতেছেন। ' মাকড়সা একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আরে ভাই তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখনা - কোন হানাবাড়ীতে আজ ডাকাত লুকাইয়া থাকে? কোন শ্মশানের ধারে ঠ্যাঙ্গাড়ে ওৎ পাতে? তবে কি বলিবে তাহারা বিলুপ্ত হইয়াছে? না ভাই, তাহারা আছে, সবাই আছে। কোথায় আছে কি ভাবে আছে তাহা নিজেই ঠাহর করিয়া দেখ।' মস্তক পার্শ্বের শাঁড়াসির ন্যায় বাহু দুটি ঘসিয়া ঘসিয়া মাকড়সা এবার যেন প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার বড় বড় পুঞ্জাক্ষি যুগল লোভে জিঘাংসায় চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। শত শত পোকার প্রতিবিম্ব যেন সেখানে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। - বাহিরের বিস্তীর্ণ অন্ধকার বনবাদাড়ের দিকে চাহিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা করিল - ' হায়রে উলুবন ঘেঁচুবনের পোকা তোরা সাবধান। তোদের কাদাজল অন্ধকারের দেশ হইতে আর তোরা আলো দেখিয়া ছুটিয়া আসিস না । নিয়ন আলো হাতছানি দিতে পারে মাত্র, জাল ছিঁড়িবার উপায় বলিয়া দিতে পারেনা।

সবুজ পোকাটা আর একবার ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। মাকড়সা দুলিয়া দুলিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল।
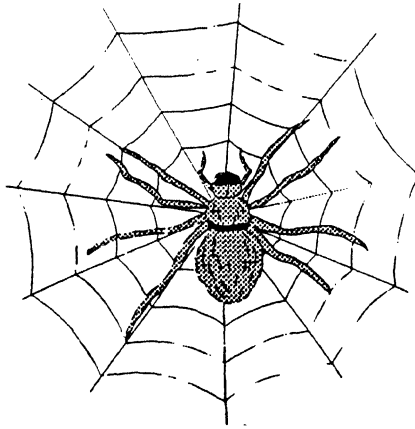
রচনাটি লেখকের ছাত্রাবস্থায় ১৯৬৮ সালে দশম শ্রেণীতে রচিত।

চড়ুই - শলিখের পিকনিক

শুভদীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষাসত্র

— তারপর, কী বলবে শুনি ?
— সে সব শুনে লাভ কী মণি?
— ক্ষতিটাই বা কী?
— না মানে! সে সব অনেক কথা।
— কী রকম! পুরানো সেই দিনের কথা!
— হ্যাঁ, সেই রকমই।
— তাহলে ভবিষ্যতের বার্তা শোনাও।
— তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।
— কোথায়? কেন? কতদূরেই বা।
— বললাম তো, ওরা তোমার অপেক্ষায় আছে।
— কিন্তু যাওয়ার উদ্দেশ্যটা, ভবিষ্যত কতখানি, সিদ্ধান্তভিত্তিক হওয়া দরকার। তাই না।
— শোনো, যা বলার বলেছি, বাকীটুকু তোমার ব্যক্তিগত অভিমত।
— তাহলে তুমিও জানো। না আমি কক্ষনো ওখানে এভাবে যাচ্ছি না। আগে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তারপর ভাবছি।
— বাঃ দারুণ অভিনয় ক্ষমতা তোমার, বাস্তবে এসো।
— কোনটা বাস্তব? অস্বাভাবিক অবাস্তবটা। দারুণ ধারণা। ভেবেছো কিছুই বুঝি না। ওসব বাঘবন্দী খেলা।
— কিন্তু তোমার প্রস্তাব ওরা মেনে নিয়েছে সব।
— কোথায়? তার প্রমাণ তো কোন কিছুই পেলাম না।
— তাহলে তোমার বক্তব্যটা কী শুনি?

বাবা 'সুদর্শন', মা 'মনিদীপা'র কথোপকথন প্রসঙ্গটা পাল্টে গেল মুহূর্তে। সবুজ গড়ের মাঠে একঝাঁক চড়ুই-শালিখ কেমন মজার আনন্দে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছে আর চারপাশে দানা অন্বেষণ করছে। এই দেখে মনিদীপা বলে ওঠে -

— ইস্, ফাঁকা মাঠে চড়ুই-শালিখগুলো কেমন খেলছে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছে। ইস্ কী মজা! চেয়ে দেখো।
— হ্যাঁ, সত্যিই তো, দারুণ! জীবন যেমন।
— আহা! তুমি না বড্ড বেরসিক। একটু ভালভাবে চেয়েই দেখো না ওদেরকে।
— কী আর দেখবো বলো। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠই ওদের খেলাঘর। জীবনযাপন।
— ইস্, কি এমন দার্শনিক ভদ্রলোক আমার! বোধশক্তি আছে তাহলে?
— তা ঠিকই বলেছো। অনুভূতির আলোয় দুনিয়াটাকে দেখতে শিখলাম কই? এমনকি ঐ সামান্য চড়ুই-শালিখগুলোকেও তোমার মতো করে আপনি ভাবতে পারলাম না। নাও, এবার সবুজ বিস্তীর্ণ গড়ের মাঠে বসে স্যান্ডউইচ গুলো খেয়ে শেষ করা যাক।
— হুঁ! আরে ! ক্যামেলিয়া, জয়, পিউ- ওরা সব গেল কোথায়? ইস্।
— ঐ তো ওরা। ওদিকটায় বেলুন নিয়ে খেলছে। সত্যি, ওদেরই আনন্দ।
— নাও, বেশি বোক না তো! শিশুরা খেলবেনা, ফূর্তি করবে না!
— কই রে, এদিকটায় আয় সব, টিফিন করে নে তারপর খেলবি।

— হ্যাঁগো, টিফিন খেয়েই চলো একটু ভিক্টোরিয়া দেখে নিই। তারপর চিড়িয়াখানা রওনা দেবো। কই রে, ক্যামেলিয়া, জয়, পিউ।
— কই ওরা সব আসে কোথায়? আয় রে সব। ক্যামেলিয়া।

মা বাবার ডাক, বিশেষ করে বেলুন ওড়ানোর থেকেও বড় মজার ব্যাপার পেটের খিদে। তার ওপর টাটকা স্যান্ডউইচ। একদৌড়ে সব ছুটে আসে হাতের বেলুনগুলোর রং-বেরং ঝলমল করছে, হাল্কা ঝকঝকে শীতের রোদ্দুরে।

ক্যামেলিয়া সবার আগে বলে ওঠে - কই মা তাড়াতাড়ি করো। চিড়িয়াখানা যাবো। নাকি এখানেই সারাটা দিন কাটাবে। সত্যি, ক্যামেলিয়ার গিন্নীপনা ভাব। একটু বড্ড হিসেবী। একটু বেশী আদরেরও। মেয়েটাই বড়ো কী না। মা-বাবাও চায় ও তাড়াতাড়ি হিসেবী আর সমঝদার হয়ে উঠুক। পড়াশোনাতে চৌকস। ক্যামেলিয়া প্রায়ই বলে, 'আমি বিয়ে করবো না, ডাক্তার, লেডী ডাক্তার হবো। মানুষের শরীরটা নিয়ে কতো দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা। মানুষ কেন এতো অসহায়। তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। কর্মক্ষমতা কমে যায়।'

সত্যিই আমাদের দেশে এখন আর ভালো ডাক্তারই নেই। বেশীরভাগই ব্যবসায়ী। দয়া-মায়া, মমতা, স্নেহ ভালবাসার সেবাধর্ম সব গো-কেসে সাজানো। আসলকথা ওদের অনেক অনেক টাকা রোজগারের ধান্ধা। হাতে গোনা দু'একজন ডাক্তার মানুষকে মানুষ ভাবে। ওরা কি মানুষ?

জীবনটাকে একনিমেষে একটা আদর্শলিপি ভেবে উদ্ধার করে ফেলে।

ওদিকে মা বলে ওঠে —

— কিরে ক্যামেলিয়া, তুইই না হয় টিফিনটা ভাগ কর। স্বামীকেও তাড়া দেয়।
— কি গো শুনছো? ছেলেদুটোকে কাছে টেনে এনে বসাও তো, কি যে করে যাচ্ছে তখন থেকে। বেলুনগুলোকে সবুজঘাসে রাখো। কেউ নেবে না।

ওদিকে ওদের খাওয়া দাওয়া দেখে বেশকিছু চড়ুই-শালিখের দল কিচির মিচির করছে, উড়ছে। এ ওর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে কী সব আলাপচারিতা করছে। কিংবা প্রেম বিনিময়।

বাবা সুদর্শন এবার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলে - 'দেখেছিস ঐ সব পাখিগুলোকে, ওরাও জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার জীব। কেমন ওরাও সব খেলছে, উড়ছে, দেখেছিস।'

এদিকে মা মনিদীপাও এবার সবাইকে তাড়া লাগান, 'নাও তো সব তাড়াতাড়ি খেয়ে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আবার পশুপাখী দেখতে হবে খন।'

ছোটছেলে জয় ততোধিক সমস্বরে বলে ওঠে

— হ্যাঁ, সেই ভালো, চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ-সিংহ দেখবো। শিম্পাঞ্জির হাতে আমার বেলুনটা ধরিয়ে দেবো। মা, বাঁদরগুলোর জন্য কিছু কলা আর ছোলাভাজা নিতে হবে কিন্তু।
— সব হবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে তো এখন। মা শাসন করে।

চড়ুই-শালিখরা তখন বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। মানুষগুলোর পিকনিক করা দেখে ওরাও সবুজ ঘাসের থেকে কী সব যেন আরও তাড়াতাড়ি খুঁটে খায়। কিংবা ওরাও বুঝতে পেরেছে যে ক্যামেলিয়া, জয়, পিউ আর বড়সড় মানুষদুটো চিড়িয়াখানায় যাবে। ওরাও মতলব এঁটেছে ওদের পিছু ধাওয়া করবে।

মা-বাবার হাত ধরে ক্যামেলিয়া, পিউ ও জয় সকলে মিলে ভিক্টোরিয়ায় ঢোকে। ভাল করে দেখে সব। আশ্চর্য হয়ে যায়। মানুষের এমন আভিজাত্যপূর্ণ আনুগত্য ও মহানুভবতা দেখে। ইংলন্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই কবে ব্রিটিশ রাজত্বকালে কলকাতা এসেছিলেন। কোম্পানী আমলে তাঁরই জন্য স্মারকস্মৃতি সৌধ এইরকম রাজপ্রাসাদ। রাজ আভিজাত্যের জন্যই স্মৃতিসৌধ।

এবার বাবাকে তাড়া দেয় জয়, চলো এবার মজার চিড়িয়াখানায়, ওখানে আরো বেশী মজা হবে। আনন্দ করবো, আইসক্রীম খাবো। পিউ বলে, না না বাবা আমরা ফুচ্‌কা খাবো।

বাসে, ক্যামেলিয়া পৌঁছাবার আনন্দে বলে ওঠে, 'ঐ তো ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এসে গেছি, আলিপুর চিড়িয়াখানা। নামো, নামো সব।'

ভর্তি বাসে ভীড় কাটিয়ে ক্যামেলিয়া আগেই রাস্তা করে নিয়ে নেমে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা'র হাত ধরে নেমে পড়ে পিউ ও জয় ।

শিশুমনে অবাধ স্বাধীনতার কি সার্বভৌম আনন্দ। প্রকৃতির রাজ্যে শিশুরাই সব থেকে খুশী, বেশী সতেজ আর স্বাধীন। সর্বপ্রথমেই সকলে মিলে বাঘ-সিংহের খাঁচার কাছে এসে দাঁড়ায়।

পিউ বলে ওঠে, ওরা কত সুন্দর, কত বড়, কী দুঃখের বন্দী জীবন ওদের।

— ঠিক হয়েছে, মানুষখেকো সব বাঘ-সিংহ। ওদের এটাই শাস্তি। বলে ওঠে জয়।

ক্যামেলিয়া দার্শনিক দৃষ্টিতে গম্ভীর। অস্ফুট মন্তব্যে তার বুকটা কেঁপে ওঠে। আহারে! 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' — বইয়ে পড়ানোর সময় ওর দিদিমনির কথাটা মনে পড়ে। কী আশ্চর্য অনুভব।

ওদিকে গড়ের মাঠের ঐ চড়ুই-শালিখগুলোও এখানে ভীড় জমিয়েছে। পিউ বলে ওঠে, আরে ঐ তো সেই পাখীগুলো। মা ওর মাথায় হাত রেখে বলে, কি রে তুই বুঝি ওদের চিনতে পারছিস। ওরা কি তোর কানে কানে ফিসফিস করে বলে রেখেছিলো যে ওরাও তোরে সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

— ধ্যুৎ! আমি কি পাখিদের ভাষা বুঝি? ওরাও কি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে? তবে দেখ মনে হয় ওরাই সব। ঐ দেখো না, ঐ যে বেশ মোটাসোটা চড়াই দুটো, তাই না মা।

এবার বাবা ওদের কথোপকথনের সঙ্গী হয়। ও একে একে ঘুরে ঘুরে দেখায় গোটা চিড়িয়াখানাটা। শিশুদের পার্কে এসে সকলে মিলে বসে। একটু জিরিয়ে নেয়। জয় ছোলাভাজা আর কলার কথা মনে করিয়ে দিতে পিউও ছুট লাগায় ওর সঙ্গে — শিম্পাঞ্জির হাতে বেলুন ধরাতে যায়।

— আরে, আরে দেখো মা, কি মজা! চড়ুই-শালিখগুলো লোকেদের ফেলো যাওয়া এঁটো খাবারের ঠোঙাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ক্যামেলিয়া অবাকদৃষ্টিতে দেখে আর ভাবে। মজার ব্যাপার হল পিউকে নিয়ে, সে দুপুরের লুচি তরকারীর ঠোঙাটার সবটুকুই সে তাদের থেকে একটু দূরে রেখে আসে আর বলে, নে তোরাও খা - আমার পেট ভরে গেছে তোদের আনন্দ দেখে।

খাবার দেখে পাখিগুলো ওদের খুব কাছে চলে এসেছে। আনন্দে ওরাও কিচির মিচির করে বলছে যেন আমরাও তোমাদের পিকনিকের সঙ্গী। ওরা কিচিরমিচির করে ক্যামেলিয়া, জয়, পিউদের যেন বলে, তোমরা খুব ভালো, তোমরা আরও ভালো হও। আরও সুন্দর হয়ে ওঠো। পৃথিবীটাকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলো। হিংসামুক্ত করো মানবমন, মানবজীবন।

ওদের এই কিচিরমিচির শুনে ক্যামেলিয়াও আনন্দে উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, তোরা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থেকে আনন্দ করলি, খুব ভালো লাগল। আমরা এবার বাড়ি ফিরে চললাম। পারলে তোরা অতি অবশ্যই আমাদের চিঠি লিখে পাঠাস। আজকের দিনটাকে আমরা সকলেই মনে রাখবো। এই বলে ওরা সকলে বাবা মায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল। পরের দিন সকালে বাড়ীর চিলেকোঠার টিভি এ্যন্টেনার দিকে তাকিয়ে জয় দেখতে পেল একটা চড়াই পাখি তার উপর বসে আছে। ও আরও দেখতে পেল, চড়াইটার ঠোঁটে একটুকরো কাগজ। জয়কে দেখতে পেয়েই পাখিটা আরও কাছে এসে ঐ কাগজের টুকরোটা নীচে ফেলে দিল। তাতে লেখা, 'ক্যামেলিয়া, জয়, পিউ শুভেচ্ছা নিও।'

শিক্ষাসত্র - প্রসঙ্গে

সঙ্গীতা ঘোষ, দশম শ্রেণী

১৮৯০ সালের শেষের দিকে বিলাত থেকে ফিরে জমিদারী দেখাশোনার ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যান শিলাইদহে। সেখানে গ্রামের সরল প্রাণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়। তিনি বুঝতে পারেন পল্লীজীবনের উন্নতি ঘটাতে না পারলে দেশের উন্নতি হবে না। পল্লীর মানুষের সংস্পর্শে থাকাকালীন তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে বাইরে থেকে সদুপোদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু কাজের মধ্যে সেটা ঘটিয়ে তোলা কঠিন। তাই তিনি পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। তিনি চাইলেন গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ। যেখানে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মী সবাই হবে এক পরিবারের সদস্যের মতো। এই আদর্শে তিনি 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কবি চেয়েছিলেন ছাত্রদের হাতেকলমে কাজ শিখিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে যাতে তারাই পরে গ্রামের উন্নতিসাধন করতে পারে।

কবির নির্দেশে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বাড়ীতে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন করেন। আশেপাশের গ্রামের ছয়জন গরীব ঘরের ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষাসত্রের কাজ প্রথম শুরু হয়। এঁরা হলেন — অতুলচন্দ্র ঘোষ, বেণুকর ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ সাহা, চিত্তরঞ্জন কর, কিরীটি কর এবং রামেশ্বর লাল। এঁরা সন্তোষচন্দ্রের বাড়ীতে একটি খড়ের চালাঘরে থাকতেন। ১৯২৬ সালে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে আসে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্য শিক্ষার রুটিন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মতো হবে না। তাদের পরীক্ষা পাশ করতে হবে না। তাদের তিনি দেবেন হাতে-কলমে পূর্ণ শিক্ষা। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাওয়ার পর ছাত্ররা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিজেরাই বেছে নেবে। কবির ইচ্ছায় ছাত্ররা বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ নিজহাতে সম্পন্ন করতো। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার, ফুলেরও সব্জীর বাগান করা, মুরগী পালন, গো-পালন, নিজেদের পরনের জামা ও পাজামা নিজেদের হাতে তৈরী করত। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুটি অত্যাবশ্যক শক্তি। তাই এই সমস্ত কাজের সঙ্গে চলত সাধারণজ্ঞান ও পড়াশোনার কাজ। এছাড়া চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের নিমিত্ত নাটকের অভিনয়, গান, ছবি ইত্যাদি কলারও চর্চা হত। পড়াশোনা চলত গাছের তলায়, মাটিতে নিজেদের হাতে তৈরী আসন পেতে। ছাত্ররা যখনই কোন গ্রামে যেত, সেই গ্রামের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করত নিজেদের উৎসাহে। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর এবং সন্ধ্যায় দিনের সমস্ত কর্মকান্ডের পর সমবেতভাবে উপাসনা ও মন্ত্রপাঠ করা হত।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন চিত্তে ঐশ্বর্যে, ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা দেহের কর্মশক্তি ও বিচিত্রকাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করুক। এ জন্য তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হতে বলেছিলেন। তিনি গাছপালা, পশুপাখী গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ছাত্রদের ভ্রমণের দ্বারা কর্মক্ষম, ক্লেশসহিষ্ণু হতে নানাস্থানে লোকযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও রক্ষাযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করতে, উদ্ভিদ, কৃষি ও আবহবিদ্যা সম্বন্ধে এবং ডাক্তারের সাহায্যে শরীর ও যন্ত্রাধ্যক্ষের সাহায্যে যন্ত্রশিক্ষার চর্চা করতে, ঘর তৈরী, ঘর মেরামত, ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ শেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গৃহস্থজীবনের যাবতীয় কার্যাবলী ছাত্ররা অনুধাবন করুক। তাঁর ইচ্ছায় ছাত্ররা ঘর, বেশভূষা, শয্যা, আসন ও শরীর পরিষ্কার রাখত। প্রত্যহ প্রাতে পরস্পরকে নমস্কার ও শিক্ষকদের প্রণাম করত। গুরুজন বা অতিথি গৃহে প্রবেশ করলে তাঁকে অভিবাদন করত। ভৃত্যদের অবমাননা করত না। বিদ্যালয়ের উৎসবে আমোদে তাদের আমন্ত্রণ করত। ছাত্ররা নিজেদের ছাত্রাবাসে অন্য ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করে আমোদের

ব্যবস্থা ও তাদের মনোরঞ্জন করত এবং সেই উপলক্ষ্যে ঘর সাজাতো। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বিনয়ী, শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে। তাই পড়াশুনা এমনকি সাহিত্যসভা, ঋতু উৎসব, নাটক অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা ইত্যাদি নানারূপ সভা সমিতি উৎসব হত আকাশের তলায় বা বাগানের ছায়ায় মাটিতে।

এরপর ১৯৫৪ সালে, বালিকা বিদ্যালয়, যেটা ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শিক্ষাসত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে বর্তমান 'শিক্ষাসত্র' রূপে পরিচিতি লাভ করে। এরপর থেকে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিতভাবে সম্পন্ন করত।

এমনি করে শত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বর্তমানে শিক্ষাসত্র এক বিশাল কর্মকান্ড গড়ে তুলেছে। এ বছর শিক্ষাসত্র পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ করেছে। এই পঁচাত্তর বছরে শিক্ষাসত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। পল্লীজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে শিক্ষাসত্রে পড়াশোনার পাশাপাশি হাত-কলমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব অনেকখানি কমে এসেছে এবং রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ নিয়ে শিক্ষাসত্রকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে শিক্ষাসত্র সেই আদর্শ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শ 'শিক্ষাসত্র' কি শুধু আমাদের স্মৃতিপটেই থেকে যাবে? তাঁর আদর্শের শিক্ষাসত্রকে গড়ে তোলা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

লিখতে চাইনা

রাজা সাহা, নবম শ্রেণী

পেন আর খাতা নিয়ে
বসে যাই চট্‌পট্,
ম্যাগাজিনে দেব বলে
লিখে যাই ফট্‌ফট্,
কী লিখব ভাবি তাই
কবিতা না গল্প?
কবিতা লেখাই ভাল
সময় যে অল্প।
লিখব কী মাথা-ছাতা
ভেবে কিছু পাই না,
এইভাবে কবিতাটা
লিখতে যে চাই না।

শারদীয়া

নবনীতা মুখোপাধ্যায়, নবম শ্রেণী

সবাই আজ আনন্দে মগ্ন
এসেছে পূজার পূণ্য লগ্ন
মেতেছে তাই তো সবার মন শারদার উৎসবে।

বাতাসে ভাসছে আগমনী রেশ,
মায়ের মূর্তি গড়া প্রায় শেষ,
সবার কণ্ঠ তাইতো ভরেছে আজ এত কলরবে।

মিটিয়ে আজকে সকল বিবাদ,
মুছে ফেলে সব দুঃখ বিষাদ,
পুজোর জন্য মণ্ডপতলে মিলিত হয়েছে সবে।

আকাশ লাগছে কত নির্মল,
নদীতরঙ্গ ছোটে কল্‌কল্‌,
মেতেছে আজকে প্রকৃতিও যে গো শরতের উৎসবে।

কাশের বনেতে লাগছে যে দোলা,
রাখাল বালক আপনভোলা,
বাজায় বাঁশি তরুতলে বসে নিজের মনে।

সেই সুরেতেই আজকে বাতাস,
হ'ল কি গো আজ এমন উদাস,
ছুটল যেথায় গন্ধ ভাসে শিউলির বনে বনে।

ভ্রমর আজিকে গুন্‌ গুন্‌ গায়,
আয় আয় সবে আয় ছুটে আয়,
শরতের এই মধুর প্রভাতে আয় ছুটে অঙ্গনে।

প্রকৃতি সেজেছে কিবা অপরূপ,
তাইতো ডেকে দেখায় মধুপ,
দেখরে সবাই বাহির হয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে।

পড়ল যে কাঠি ঢাকে ও ঢোলে,
সানাই মধুর আওয়াজ তোলে,
পুজো মণ্ডপে কাঁসর ঘন্টা বাজায় আজকে সবে।

মা এসেছে আজ মণ্ডপতলে,
তাইতো মিলেছে আজকে সকলে,
বাঙালীর সেরা পুজো হবে এই শারদার উৎসবে।

আমার এই পথ-চলাতেই আনন্দ

পাপিয়া গুরুং শ্রেষ্ঠা, দশম শ্রেণী

চলমানতাই জীবনের লক্ষণ। সৃষ্টি র আদি থেকেই সভ্যতা কেবল সময়ের পথে এগিয়ে চলেছে। বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই সেখানে। পরিবর্তনই এই চলমানতায় আনে বৈচিত্র্য। তাই পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে যা ছিল জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড, তা আজ শস্য -শ্যামলা প্রাণভূমিতে পরিবর্তিত হয়েছে। কী সেই রহস্য বিশ্বের কাছে তা ধাঁধা। কিন্তু আমি বলি তা গতি, তা পথ চলা। সময়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। এগিয়ে চলব ততদিন, যতদিন আমাদের প্রাণরসের ক্ষুদ্রতম কণাও জীবিত থাকবে।

জীবনের পথে এগিয়ে চলার মধ্যে পরিবর্তনই আনন্দ। সুপ্ত বীজ সদ্যোজাত কিশলয় হয়ে যখন মাটির কঠিন অন্ধকার ভেদ করে আলোর জগতে প্রবেশ করে, তখন তার নতুন জীবনের অভিষেক হয়। আকাশ, বাতাস, মাটি তার অঙ্গে-অঙ্গে আনন্দতরঙ্গের হিল্লোল আনে। ধীরে ধীরে সে তার বাহুপ্রসারিত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। আকাশকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মাথার উপর সেই আকাশ সেই আলো পুরানো হয়ে যায়না। বরং সে যেন প্রতিদিন নতুন-নতুন রূপ নিয়ে ধরা দেয়।

ক্রমে সেই শিশু চারাগাছ তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অসীমের কোলে বিলীন হয়ে যায়। মৃত্যুই জীবনের মাঝে চরম সত্য। আমরা জীবনের পথে মৃত্যুর দিকে, বিনাশের দিক এগিয়ে যাই। তাই বলে মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমরা জীবনের পথ চলাকে থামিয়ে দিই না।

এই পৃথিবী এক অপার বিস্ময়। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা তার কতটুকুই বা উপভোগ করতে পারি। তাই রূপ-রস-গন্ধ, আমাদের যত কাছে থাকে ততই অধরা থেকে যায়। এই অধরাকে ধরার জন্য মানুষ যুগে-যুগে ছুটে চলেছে, এগিয়ে চলেছে। এই চলার কোনো অন্ত নেই। তাই কবি বলেছেন :

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না '।

প্রকৃতির এই অফুরন্ত বিস্ময় ভান্ডারের ক'টা রত্নের সন্ধানই বা মানুষ পেয়েছে। তাই কবির ভাষায় —

"The World's a bubble, and the life of man
less than a span."

কালের প্রবাহে এই পৃথিবীর বুকে এসেছে কত মানুষ। তাদের সুখদুঃখের কান্না হাসির বিচিত্র কাহিনী রচিত হয়েছে এখানেই। আজ তারা নেই, আছি আমরা। কাল থাকবে অন্য কেউ। এই চলার সাক্ষী থাকবে এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই আলো আর এই প্রবাহমান সময়।

কবির জিজ্ঞাসা করেছেন —

" Doth then the world go thus, doth all thus move ?"

সত্যিই সেদিন এই পৃথিবী থাকবে। শুধু থাকব না আমরা। এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হবে নতুন অভিনেতা, শুরু হবে নতুন অভিনয়। কিছুই চিরদিন থাকে না, থাকবে না। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি —

'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।' কারণ এই পথ জীবনের পথ।

যন্ত্র

স্বাতীলেখা ঘোষ, নবম শ্রেণী,

সোনি আর রোলি — দুজনে হরিহর আত্মা। দুজনে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। ওরা থাকে সল্টলেকের 'ডি' ব্লকে। চারতলায় পাশাপাশি ফ্ল্যাট ওদের। দুজনে দুজনকে ছাড়া থাকতে বা থাকার কথা ভাবতে পারে না। দুজনেই ক্লাস সেভেনে পড়ে। দুজনে এক সঙ্গে স্কুলে যাওয়া, পড়াশুনো করা, খেলা, নাচ, গান সব করে। তারা কোনো বিষয়েই কম যায় না। ডানপিটেপনা আর পড়াশুনা সব একসাথেই চলে। সোনির বাবা গবেষক, আর রোলির বাবা ব্যবসায়ী।

একবার সোনি ও রোলিরা সবাই মিলে 'সায়েন্স সিটি'তে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে রোবট ডাইনোসর দেখে সোনি বায়না করল তার একটা রোবট বন্ধু চাই। সোনির বাবা তাকে খুব বোঝালেন, রোবট বুদ্ধিহীন, নিজে থেকে কাজ করতে পারে না। কোথাও যন্ত্রের গোলমাল হলেই রোবট অকেজো হয়ে পড়বে। সোনির তো কি সুন্দর একটা ছটফটে বন্ধু আছে। তার রোবটে কাজ কী? সোনি কোনো কথা শুনতে চায় না, রোবট তার চাই-ই-চাই। রোলি মনে-মনে খুব দুঃখ পেল — সে সোনির একমাত্র প্রিয় বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সোনির রোবট চাই!

একদিন সোনির বাবা সোনিকে একটা রোবট ও রোলিকে একটা রোবট পুতুল কিনে দিলেন। সোনি খুব খুশী। সে কেবল রোবটটাকে নিয়ে পড়ে থাকে, রোবটটার একটা নামও দিয়েছে সে, 'রিমো'। সোনি এখন রোলির সঙ্গে খেলে না। রোলির কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে। রোলির মাঝে-মাঝে হিংসা হয় রিমোর উপর। সে এখন সোনির হৃদয় জুড়ে বসে আছে।

সোনির এখন রাতদিনের সঙ্গী রিমো। খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে সব কিছুতেই সোনি রিমোর সঙ্গে। রিমোর সঙ্গে খেলা, বেড়াতে যাওয়া। রোলির আর সহ্য হয় না। সোনি আগে রোলির সঙ্গে পার্কে যেত, ফুচকা খেত, দোলনায় দুলত, সেসব দিন এখন কোথায় গেছে।

একদিন সোনি স্কুলে যাওয়ার আগে রিমোকে ব্রেকফাস্টে ফ্রুটজুস আর টিফিনে হ্যামবার্গার দিতে বলল, রিমো হঠাৎ এক কান্ড করে বসে, সে সোনিকে ফ্রুটজুসের বদলে কমপ্ল্যান ধরিয়ে দিল। সোনি তো অবাক, রিমো কখনও এমনটা করে না। সোনি রিমোকে কিছু বলল না। স্কুলে টিফিন টাইমে সে যখন টিফিন বক্স খুলল, দেখল তাতে ব্রেডটোস্ট দিয়েছে রিমো। সোনি এবার খানিকটা রেগেই গেল। বাড়ী ফিরে সে খাবার চাইলে রিমো একগ্লাস জল এনে তার মাথায় ঢেলে দিলো।

এবার সোনি বুঝল রিমোর নিশ্চয় কোথাও গোলমাল হয়েছে। মা, বাবা, কেউ ঘরে নেই, সোনি খুব চিন্তায় পড়ে গেল। রিমো যদি তার গলা টিপে ধরে। সোনি খুব ভয় পেয়ে গেল। সোনি রিমোকে ফ্ল্যাটের মধ্যে তালা বন্ধ করে রেখে রোলির ফ্ল্যাটে চলে গেল। সেখানে রোলিকে সব কথা বলল। রোলি রিমোকে দেখতে চাইলে, সোনি তাকে বাধা দিল।

সোনির মা, বাবা বাড়ী ফিরলে সোনি তাদের সব কথা বলল। সোনির বাবা রিমোকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন রিমোর মাথার একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। স্ক্রু'টা খুলে মাথার ঢাকনাটা একটু ফাঁক করতেই একটা নেংটি ইঁদুর লাফিয়ে পালাল। সোনির বাবা বললেন, ঐ ইঁদুরটা রিমোর মাথার মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। তাই রিমোর যন্ত্র ব্রেনে যে প্রোগ্রামগুলো পাঠানো হচ্ছিল সেগুলো উলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। আর সেজন্যই রিমো এমন গোলমাল করছিল। তিনি আরও বললেন, 'যন্ত্র কখনও মানুষের স্থান নিতে পারে না, তুমি রোলিকে নিয়েই থাক, রিমোর চিন্তা ছেড়ে দাও।'

সোনি তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে রোলিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আনন্দের আবেগে রোলির চোখেও জল এসে গেল। আবার আগের মতো সোনি ও রোলির বন্ধুত্ব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

লঙ্কা বিজয়

অভিনন্দন সেন, দশম শ্রেণী

শেষ পর্যন্ত মিন্টুদাকে আমাদের কথা মানতেই হল। সরস্বতী পুজোয় আমরা একটা নাটক করবো এ ইচ্ছেটা আমাদের অনেকদিনের। কিন্তু হাল ধরার মতো কাউকে পাচ্ছিলাম না বলে ইচ্ছেটা সফল হচ্ছিল না। দক্ষিণপাড়ার নবুরা প্রত্যেকবার সরস্বতী পুজোয় নাটক করে। অনাদিকাকাই ওদের জন্য নাটক লেখেন এবং নির্দেশনা দেন। আমরা তেমন কাউকে পাচ্ছিলাম না। দিন কয়েক হল শুভজিতের মামাতো দাদা এখানে বেড়াতে এসেছেন। মিন্টুদার কথা শুভজিতের কাছে এর আগে অনেকবার শুনেছি। কলকাতার কোন একটা নামকরা নাটকের গ্রুপে নাকি অভিনয় করেন। সুযোগ বুঝে আমরা গিয়ে মিন্টুদাকে ধরলাম। প্রথমে মিন্টুদা রাজী হন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর আমাদের অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

মিন্টুদা বললে, 'কি ধরনের নাটক তোমরা করতে চাও? সামাজিক, পৌরাণিক না ঐতিহাসিক?'

কে যেন বলে উঠল, ঐতিহাসিক।

সুখেন প্রতিবাদ করল, 'কেন, সামাজিক নয় কেন?'

সদানন্দ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'কেন শুনবি? সামাজিক নাটকে ধুতি, সার্ট, প্যান্ট বড়জোর পাজামা পাঞ্জাবী পরতে পারবি, তাছাড়া আর সাজগোজের স্কোপ কোথায়?'

— 'ঠিক আছে, আগে তোমরা নাটক ঠিক কর, তারপর দেখা যাবে।'

—' আমার কাছে একটা নাটক আছে', শুভজিৎ বলল। 'লঙ্কা বিজয়। মানে রামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের কথা। ঐ নাটকটা করলে ভাল হয়। ভালো ভালো ড্রেস পরার সুযোগ পাওয়া যাবে।'

— 'ঠিক আছে, কাল বিকাল পাঁচটায় তোমরা এসো, আগে আমি নাটকটা পড়ে দেখি। যদি মনে হয় ওটা করা যাবে তবে কাল থেকেই রিহার্সাল শুরু হবে', মিন্টুদা আশ্বাস দিলেন।

যাইহোক, 'লঙ্কা বিজয়' নাটকের রিহার্সাল জোর কদমে শুরু হয়ে গেল। আমরা দশ-বারোজন ছেলে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে রিহার্সাল দিচ্ছি। হঠাৎ একদিন মিন্টুদা বললেন, 'একটা কাস্টিং এখনও করা হয় নি, সেটা হল কুম্ভকর্ণ। তোরা তো সব খ্যাংরাকাঠি। জয়ন্তর স্বাস্থ্য একটু ভালো, ওকে তো রাবণের পার্টটা দিয়েছি। কিন্তু কুম্ভকর্ণকে তো একটু বেশ মোটোসোটা না হলে মানাবে না।' শুভজিৎ বলল, 'আছে একজন, তবে সে ঐ পার্টটা করতে পারবে কি না বলতে পারি না। মিন্টু দা হেসে বললেন, 'পার্ট করাতো কিছুই নেই, ওর পার্ট-টা তো ঘুমের, শেষ পর্যন্ত অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘুম ভাঙ্গালে বিরক্তি প্রকাশ করা। ব্যস, এই তো।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই কার কথা বলছিস।' শুভজিৎ গালদুটো ফুলিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছিস না, নিধুর কথা বলছি।' অরিন্দম হেসে বলল, 'ওর যা মাথা মোটা, শেষকালে হয়তো...।' মিন্টুদা ওকে থামিয়ে বললেন, 'তাতে কোনো ক্ষতি নেই, মাথার তো কোনো কাজই নেই।' তাই নিধু এল। ঘুমিয়ে থাকার রিহার্সালও দিল। কিন্তু দুদিন যেতেই বলল, একটা কথা বলব মিন্টুদা? বলো, মিন্টুদা বলেন। 'আমার মুখে কি একটাও ডায়লগ থাকবে না?' তন্ময় ব্যাঙ্গভরা গলায় বলল, 'ডায়লগ চাস? এই যে পেয়েছিস এই যথেষ্ট, তার ওপর আবার ....! ' বাধা দিলেন মিন্টুদা, 'আহা অমন করে বলছো কেন? ঠিক আছে আমি তোমার জন্য দু-লাইন ডায়লগ দিয়ে দিচ্ছি। তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে বিরক্তি ফুটে উঠবেই তখন তুমি বলবে, "কে? কে আমার নিদ্রাভঙ্গ করল? কার এত দুঃসাহস? সে কি আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়?" নিধু খুব খুশী হয়। আমাদেরনাটকের মহড়া এগিয়ে চলে। দক্ষিণপাড়ার নবুরা এবার সরস্বতী পুজোর পরের দিন নাটক করবে না। কারণ ওরা আমাদেরনাটক দেখতে আসবে। আমরা সবাই বলাবলি করছি। এবার নবুদের দেখিয়ে দেব নাটক কাকে বলে। শুভজিৎ হয়েছে রাম। লম্বায় ওর চেয়ে আমি একটু কম, তাই লক্ষ্মণের পার্ট-টা আমার কপালে জুটেছে। হনুমান কেউ করতে রাজী নয়। মিন্টুদা বলল, কেন, হনুমান সাজতে আপত্তি কেন? হনুমান তো একজন মহাভক্ত এবং পরমবীর ছিলেন। আমতা আমতা করে সুখেন্দু বলল, এমনিতে কোনো আপত্তি নেই তবে পিছনে ঐ লম্বা ল্যাজটা লাগাতে হবে তাই ....। ছোট্টু

হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা মিন্টুদা ল্যাজটা বাদ দিলে হয় না।' ক্ষেপে গেলেন মিন্টুদা, 'তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই, বলি ল্যাজকাটা হনুমান দিয়ে লঙ্কা বিজয় হবেটা কি করে শুনি?' শেষপর্যন্ত আমাদের বাড়ীর কাজের ছেলে নবীনকেই হনুমানের পার্ট দিতে বাধ্য হলেন মিন্টুদা। নবীনতো ভীষণ খুশী, সাততাড়াতাড়ি বাড়ীর কাজগুলো সেরে ফেলে রিহার্সালে চলে আসে। মা'তো রেগে আগুন। আমাদের বলেন, 'তোরা নাটক করছিস কর, তাই বলে আমার নবীনকে টানা কেন? এখনতো ... কোনো কাজেই ওর মন নেই।' আমি বললাম, 'কী করব বলো মা, কেউ যে হনুমানের পার্ট-টা করতে রাজীই হল না।' মা হেসে বললেন, 'তা ভালোই - নবীনকে তো আর বেশী রিহার্সাল দিতে হবে না, ওতো নিজেই একটা আস্ত হনুমান।'

নাটকের দিনটা এসে গেল। সকাল থেকে তোড়জোড় চলছে। স্টেজ বাঁধা, সামিয়ানা খাটানো। দর্শকদের বসার জন্য ত্রিপল পাতা। পাড়ার গণ্যমান্যদের জন্য গুটিকয়েক কাঠের চেয়ার। মিন্টুদা ভীষণ ব্যস্ত। নিজেই আমাদের মেকআপ দিচ্ছেন। নবীন তার লেজ নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। এই একমাস ধরে তীর-ধনুক, গদা, তলোয়ার, মুকুট ও অন্যান্য সব সরঞ্জাম আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি। মা, কাকী, জেঠীদের শাড়ী , দিদিদের নকল গয়না, ঝুটো মুক্তোর মালা সব এখন আমাদের করায়ত্ত। সময় যত এগিয়ে আসছে বুকের মধ্যে যেন ড্রাম-বিট্ শুনতে পাচ্ছি। মুখে কিন্তু কেউ কিছু প্রকাশ করছি না। মেক-আপ শেষ হলে মিন্টুদা সবাইকে একজায়গায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'কোনো ভয় নেই, নিজেদের চরিত্রগুলো ঠিকমতো করবে। আমি বলতে চাই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের নাম ভুলে যাও, যে চরিত্র করছো নিজেকে তাই ভাববে।' নিধু একগাল হেসে বললো, কোনো চিন্তা কোরো না মিন্টুদা, 'আমি তো রিহার্সালের প্রথমদিন থেকেই নিজেকে 'কুম্ভকর্ণ' বলেই ভাবছি।' খুশী হলেন মিন্টুদা, হেসে বললেন, 'এই তো চাই, নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে, যে চরিত্র করছো ভাবতে হবে তুমি সে-ই।'

নাটক শুরু হল। প্রায় প্রতি দৃশ্যেই হাততালি পড়তে লাগল। আনন্দে ও গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে। মিন্টুদার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল। এবার নিধুর দৃশ্য। কুম্ভকর্ণ দীর্ঘ ছয়মাসের নিদ্রামগ্ন। নিধু চমৎকার ঘুমের অভিনয় করছে, তাঁকে অসময়ে জাগানোর প্রচেষ্টা করছে রাক্ষস-অনুচররা। কানের কাছে বাজনা বাদ্য শুরু হল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ আর জাগে না। মিন্টুদা উইংসের আড়াল থেকে একনাগাড়ে বলতে থাকেন, 'এইবার উঠে পড় নিধু, আর ঘুমোতে হবে না।' নিধুর কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনুচররূপী কানু, নুটু, ছোট্টু, ধীরাজ সবাই মিলে ফিস্ ফিস্ করে বলতে থাকে, 'এ্যই নিধু, কী কথা ছিল? কানের কাছে ঢোলটা বাজতেই উঠে পড়তে হবে। উঠে পড়।' কে কার কথা শোনে। নিধু উঠল না। দর্শকেরা গোলমাল শুরু করে দিল, কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'তোদের কুম্ভকর্ণ আজ আর জাগবে না রে। চিরঘুমে চলে পড়েছে।' সমস্বরে শেয়ালের ডাক ডেকে উঠল যেন কারা। সম্ভবত দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা। আমাদের তখন লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। উইংসের পাশে মিন্টুদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। হাত নেড়ে নির্দেশ দিলেন, পর্দা ফেলে দিতে। পর্দা পড়ে যেতেই নিধু ধড়মড় করে উঠে বসে তার ডায়লগ বলতে শুরু করে দিল।

মিন্টুদা তেড়ে গেলেন নিধুর দিকে, দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'হতভাগা, সব গুবলেট করে দিয়ে এখন ডায়লগ বলা হচ্ছে। এখন তোর ডায়লগ শুনবে কে ? ওরে, এতক্ষণ জাগিস নি কেন?'

নিধু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে।' 'সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলি', মিন্টুদা ফুঁসতে লাগলেন। 'তা কি করবো? তুমিই তো বললে চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হয়..... তাই।'

—'তাই বলে তুই স্টেজে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বি?'

— 'বারে সত্যিকারের না ঘুমোলে, কুম্ভকর্ণের চরিত্রের সঙ্গে ....'

—' রাখ তোর চরিত্র। আমাদের এত পরিশ্রম সব মাটি হয়ে গেল। আমার আর কী। আমি তো দুদিন পরে চলে যাব। তোরাই দক্ষিণপাড়ার ছেলেদের কাছে মুখ দেখাতে পারবি না। আমি যদি আগে জানতাম যে তুই সত্যি-সত্যি একটা কুম্ভকর্ণ, তবে তোকে কি ঐ পার্ট-টা দিতাম?'

এই ঘটনার পর থেকে দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা আমাদের সবাইকে কুম্ভকর্ণ বলে ডাকতো। তারপরই আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও নাটক করলে ভুলেও নিধুকে দলে নেব না।

শুভ্রর স্বপ্ন

রুদ্রশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দশম শ্রেণী

হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল শুভ্র। রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটাটা তখন জানাচ্ছে রাত তিনটে। ঢক্-ঢক্ করে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার যখন শুল সারা পিঠটা ভিজে গেছে ঘামে। তারপর বাকী রাতটা আর ঘুম এল না কিছুতেই। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ আগের দেখা স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগল। ও দেখছিল যে একটা বিশাল ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা একটা পথ ধরে হেঁটে চলেছে। কোথায় যে যাচ্ছে তা ও নিজেও জানে না। গোটা মাঠটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। দিগন্তে অস্তগামী সূর্য, ঝিরি-ঝিরি হাওয়া বইছে। দূরে-দূরে চরছে একটা গোরু। চারিদিকে একটা শান্ত পবিত্র ভাব। এমনসময় একটা ঝড় উঠল। সেই ঝড়ে কোথা থেকে উড়ে আসতে লাগল নানা রঙের পলিথিনের প্যাকেট। দেখতে-দেখতে গোটা মাঠটা ছেয়ে গেল ছেঁড়া, ভালো নানারকম প্যাকেটে। মাঠের মাঝখানে যে ছোট্ট সুন্দর পুকুরটা ছিল, সেটাও ঢেকে গেল প্যাকেটে। এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে শুভ্র যখন ভাবছে যে কী করবে তখন দেখে যে উড়ে আসা প্যাকেট জমতে-জমতে ওর কোমর পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ছুটে পালাতে গিয়ে দেখে হাত, পা সব অবশ হয়ে গেছে। কিছুতেই ওখান থেকে নড়তে পারছে না। এদিকে ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে আর ক্রমেই আরও বেশী-বেশী প্যাকেট এসে জমছে ওর চারিদিকে। শুভ্র বুঝতে পারছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে এই প্যাকেট রাশির মধ্যে। এমনসময় ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। তারপর বিছানায় বসে এটা সেটা নানারকম কথা ভাবতে লাগল। মনে পড়ছে ভুলুটার কথাও। তার অসাবধানতার জন্যই তো প্রাণ দিতে হল বেচারাকে। সেদিন ছোটকা পই-পই করে বলে দিয়েছিল যে মিষ্টির প্যাকেটটা যেন ডাস্টবিন ছাড়া অন্য কোথাও না ফেলে, কিন্তু সেদিন ছোটকার কথায় কান দেয়নি শুভ্র। প্যাকেটটা ফেলেছিল ভুলুর বাটিটার পাশেই। আর ভুলুও প্যাকেটাটা খাবার মনে করে খেয়ে নিয়েছিল। পরদিন দুপুর থেকে ভুলুর চলাফেরায় কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিল শুভ্র। কিছু খায় না, মাঝে-মাঝে কেঁউ-কেঁউ করে চেঁচায়, যেন ওর পেট ব্যথা করছে। ক' দিন বাদে ভোরের দিকে মারা গিয়েছিল ভুলু।

সকালে উঠে রাতের স্বপ্নটার কথা ছোটকাকে বলল শুভ্র। শুনে গম্ভীর হয়ে ছোটকা বলল, না রে শুভ্র, তোর এই স্বপ্নটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার জিনিস নয়। সমস্ত মানুষকে যদি এ ব্যাপারে সতর্ক করে না তোলা যায় তাহলে হয়তো এমন দিন সত্যিই আসবে যেদিন এইরকম পলিথিনের প্যাকেটে সারাদেশ ভরে যাবে। একেই বলে প্রকৃতিদূষণ। আরও নানাভাবে আমরা বাড়িয়ে চলেছি এই পরিবেশ দূষণের মাত্রা। এর ফল হবে সাংঘাতিক। আমরা সময়মতো সচেষ্ট না হলে হয়তো এই পথেই এগিয়ে আসবে প্রাণী জগতের অন্তিম দিন। ডাঙাকে পরিষ্কার রাখতে এইসব পলিথিন প্যাকেট ফেলা হচ্ছে সমুদ্রে। অনেক জলজ প্রাণী এই সব পলিথিন প্যাকেট খেয়ে বা এর দ্বারা চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে। তুই যেমন স্বপ্নে চাপা পড়ে যাচ্ছিলি, সেইরকম। ওদের তো আর বুদ্ধি নেই যে দেখেশুনে খাবে। যা ওদের কাছে খাবার মনে হয় তাই ওরা গিলে নেয়। আর পলিথিন তো হজম হয় না, পেটেই থেকে যায় ফলে বিষক্রিয়া হয়। আর সবথেকে সাংঘাতিক ব্যাপার হল, পলিথিন পচে না। প্রকৃতিতে যত জিনিস তৈরী হয়েছে, অর্থাৎ যা কিছু জৈব বস্তু তা প্রকৃতির নিয়মেই পচে গিয়ে আবার প্রকৃতির উপাদান হয়ে মিশে যায়। কিন্তু পলিথিন না পচার ফলে ক্রমে প্রকৃতিতে জমতে থাকে। অনেক সময় ঐ সব বাতিল পলিথিন প্যাকেট রাস্তার নর্দমায় আটকে যায়। তখন আর জল যেতে পারে না। ফলে ঐসব নোংরা জল খাবার জলের সঙ্গে মিশে জল-দূষণ ঘটায়। এই জন্যই তো বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন পচনশীল পলিথিন উদ্ভব করতে এবং অনেকটা সাফল্যও এসেছে। আমাদেরও উচিত যতটা সম্ভব পলিথিন প্যাকেট ব্যবহার কমানো আর যেখানে সেখানে পলিথিন প্যাকেট না ফেলে ঠিক জায়গায় ফেলা। দেখলি তো সেদিন আমার কথা শুনিসনি বলেই ভুলুটা বেঘোরে মারা গেল। শুনতে-শুনতে শুভ্র ঠিক করে ফেলল, পটলা, বাবুন, খোকনদের নিয়ে একটা ক্লাব করবে

যার কাজ হবে সাধারণ মানুষজনকে এই পলিথিন প্যাকেটের ব্যাপারে সচেতন করা।

এই ঘটনার পর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা মাস। শুভ্রদের সেই ক্লাব এখন অনেক বড় হয়েছে। আরও অনেক ছেলে এই ক্লাবের সদস্য হয়েছে। ওরা বাড়ী-বাড়ী দোকানে-দোকানে গিয়ে, আবার কখনও পোস্টার লিখে সাধারণ মানুষকে বোঝায়, এই পলিথিন প্যাকেট যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করার জন্য। আর যেখানে-সেখানে না ফেলার জন্য। প্রথম-প্রথম কেউ কান দেয় নি ওদের কথায়, কিন্তু আজ অনেকেই বুঝেছে যে পলিথিন কতখানি ক্ষতিকর। তাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শুভ্রদের এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন।

আজ অনেক দিন পর ফিরে এসেছে ঐ রকমই এক রাত্রি। আর আশ্চর্যের ব্যাপার আজও শুভ্র দেখছে ঐ স্বপ্নটাই। কিন্তু শুভ্র দেখল যে হঠাৎ কোত্থেকে আর একটা ঝড় এসে ঐ সব নোংরা পলিথিন প্যাকেট উড়িয়ে নিয়ে গেল। পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্ত মাঠ, পুকুর, গাছপালা। আজ শুভ্র প্রাণভরে দেখছে প্রকৃতির শ্যামল শোভা। আজ আর ওর ভেঙ্গে যাবে না ঘুম।

স্বার্থপরতা

রাখী দাসমাহান্ত, নবম শ্রেণী

সেই আদিমযুগে যখন থেকেই মানুষের জ্ঞানোন্মেষ ঘটেছে, তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থপরতা-র। তবে মাত্রার দিক দিয়ে তখন হয়তো কম ছিল এবং এখন বেশী হয়েছে। যখন থেকেই মানুষ দলবদ্ধ হল, তখন থেকেই মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার আবির্ভাব ঘটেছে। দলবদ্ধ মানুষ প্রথমে দলের মধ্যে ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করত, পরে নিজের পরিবারের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে শুরু করল আর বর্তমানে ভাবে শুধুই নিজের কথা।

যিনি দেশের নেতা তিনি শুধু নিজের দেশের কথাই ভাবেন, কিন্তু অন্য কোনো দেশের জন্য তিনি নিজের দেশের মতো অতখানি চিন্তা করেন না। তাই তিনি দেশপ্রেমী। আবার অন্য দেশ তাঁকে স্বার্থপর আখ্যাও দিতে পারে। আবার যিনি দলের নেতা তিনি একদিক থেকে যেমন দলপ্রেমী অন্যদিক থেকে তেমনি স্বার্থপর। এইভাবে স্বার্থপরতার হিসাব কষলে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকেই স্বার্থপর বলতে হয়। দেখা যাবে, মানুষের একমাত্র ধর্মই স্বার্থপরতা।

কিন্তু নিজের কথা, নিজের পরিবারের বা নিজের দেশের কথা চিন্তা করা কখনোই স্বার্থপরতা হতে পারে না। এটা স্বার্থপরতা হলে পৃথিবীতে কোনোও ব্যক্তিই মহৎ থাকবেন না, মহত্ত্ব পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অন্যকে ফাঁকি দিয়ে বা অন্যকে কষ্টে ফেলে নিজে সুখ-সুবিধে ভোগ করাটাই হল স্বার্থপরতা। পৃথিবীতে এরকম স্বার্থপরতারও অভাব নেই। আর তাই 'স্বার্থপর' কথাটির এত বিস্তার। এরকম স্বার্থপরদের সত্যিই কখনো উন্নতি ঘটে না। তারা যেমন অন্যকে কষ্ট দেয়, ফাঁকি দেয়, তেমন নিজেরাও কষ্ট পায় ও নিজের ফাঁকির জালেই পড়ে। তারা যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তাদের শুধু নিজের স্বার্থ আগলাতেই সময় বয়ে যায়। জীবনের আসল অর্থও তারা বুঝতে পারে না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তারা নিজেদের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত থাকে। তাই জীবনকে ভালভাবে উপভোগ করতে পারে না। শুধু যে মানুষই স্বার্থপর হয় তাই নয় সজীব প্রাণী মাত্রেই স্বার্থপর হতে পারে। এমনকি একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও বাঁচার তাগিদে স্বার্থপর হতে পারে।

মানুষের মধ্যে মানুষই স্বার্থপরতার উদ্ভব ঘটিয়েছে। আবার মানুষই মানুষকে স্বার্থপর আখ্যা দিয়েছে। পরবর্তীকালে হয়তো স্বার্থপরতার আরও বিকাশ ঘটবে অথবা স্বার্থপরতা অবলুপ্ত হবে। তবে একথা ঠিকই যে, কেবলমাত্র স্বার্থপরতার সর্বস্তরীয় অবলুপ্তিই ঘটলেই পৃথিবী আবার নির্মল, নিষ্পাপ ও সুন্দর হতে পারে।
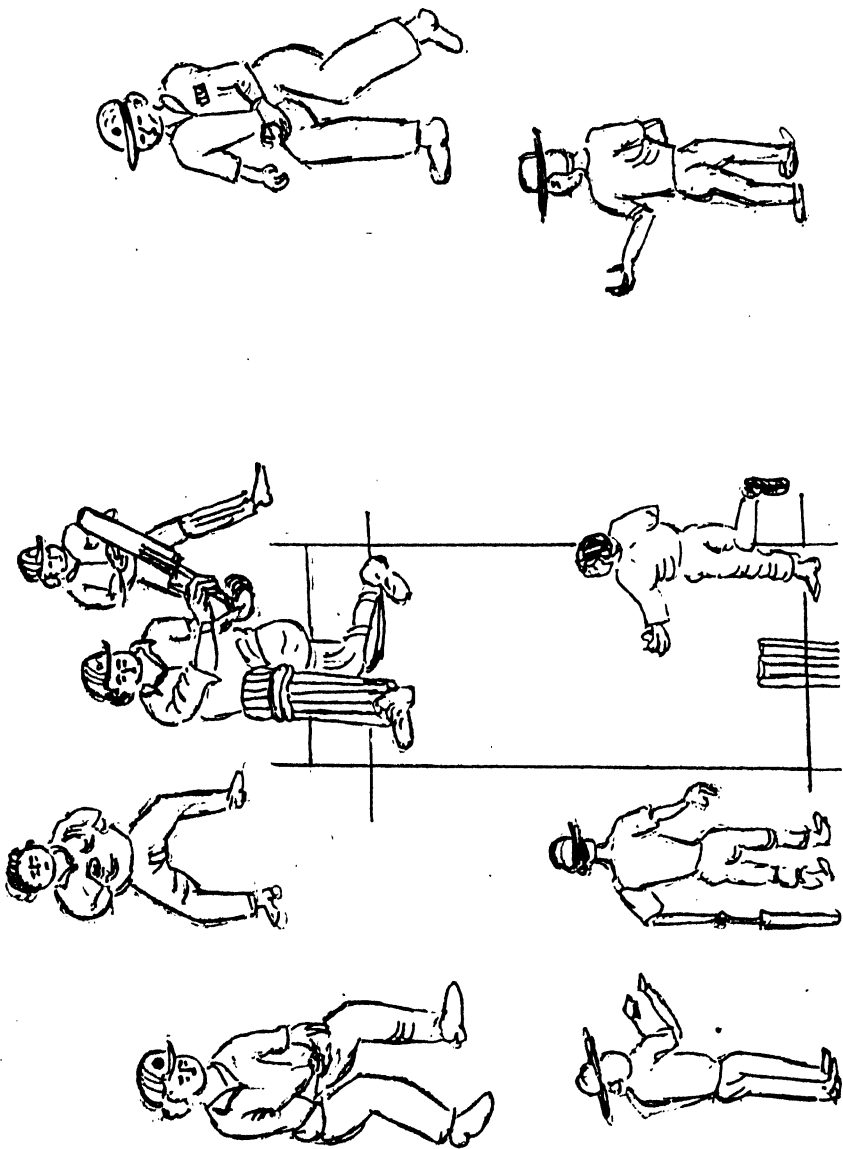
বকুল লেট, দশম শ্রেণী

NIIT

BOLPUR CENTRE

Wishes You all Success

for

The Second Re-Union

Function

of

Siksha Satra

From

Members of NIIT *Bolpur*

An warm Good-wishes to the

Platinum Jubilee

of Siksha Satra

Birbhum Lodge

Shyambati, Santiniketan

Survival of man Depends on Survival of Plants & Animals
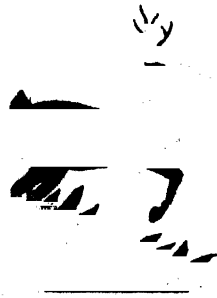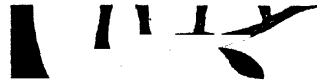
Ballavpur Wild-Life Sanctuary
Birbhum Division
Bolpur Range

শিক্ষাসত্রের ৭৫ তমবর্ষপূর্তি
উপলক্ষে সবারে জানাই অভিনন্দন

সুনীল রায়

নির্ভরযোগ্য বাড়ী নির্মাণের প্রতিষ্ঠান

যোগাযোগ :

সুভাষপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫

দূরভাষ - (০৩৪৬৩) ৫৩০৭৪

CAMELLIA

HOTEL & RESORT

SANTINIKETAN

With best compliments from
Mark Meadows
Santiniketan
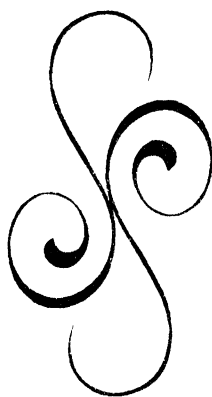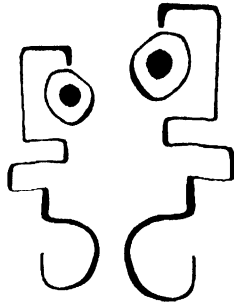
শ্রীনিকেতন - শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের
উদ্যোগে

রূপায়নের পথে

রবীন্দ্রভবন বোলপুর-শান্তিনিকেতন

এই প্রকল্পে থাকবে :

১. ৭৫০ দর্শক আসন বিশিষ্ট মূল প্রেক্ষাগৃহ এবং এর সঙ্গে ২০০ আসনের সেমিনার হল।

২. ১০০০ আসন যুক্ত মুক্ত মঞ্চ।

৩. গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী, গৃহ সম্বলিত একটি ভবন।

৪. প্রশাসনিক দপ্তর ভবন।

৫. ৩০ শয্যা বিশিষ্ট শিল্পীগণের আবাসগৃহ।

৬. রেস্তোঁরা ও ছোট বিপণী।

৭. প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভিত উদ্যান ও জলাধার, ঝরণা এবং ভাস্কর্য প্রাঙ্গণ।

৮. সার্ভিস ব্লক ও রক্ষী গৃহ।

৯. গাড়ী রাখার স্থান।

শ্রীনিকেতন - শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপিত
পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি সংস্থা)
শ্রীনিকেতন, বীরভূম।